নবম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভীষ্মদেবের প্রয়াণ

শ্লোক ১

সূত উবাচ
ইতি ভীতঃ প্রজাদ্রোহাৎ সর্বধর্মবিবিৎসয়া ।
ততো বিনশনং প্রাগাদ্ যত্র দেবব্রতোঽপতৎ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **প্রজা-দ্রোহাৎ**—প্রজা হত্যা করার জন্য; **সর্ব**—সব; **ধর্ম**—ধর্ম; **বিবিৎসয়া**—জানার জন্য; **ততঃ**—তারপর; **বিনশনম্**—যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল; **প্রাগাৎ**—তিনি গেলেন; **যত্র**—যেখানে; **দেবব্রতঃ**—ভীষ্মদেব; **অপতৎ**—প্রয়াণের জন্য শয্যাশায়ী ছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে বহু প্রজা হত্যা করার জন্য ভীত হয়ে যুধিষ্ঠির মহারাজ অতঃপর ধর্মতত্ত্ব জানার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করলেন। সেখানে ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন।

তাৎপর্য

এই নবম অধ্যায়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম পালন সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। এই মর্তলোক থেকে তাঁর প্রয়াণের সময় ভীষ্মদেব পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তিম প্রার্থনাও নিবেদন করবেন, এবং এইভাবে তিনি জড় জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। ভীষ্মদেব বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যে তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতে সক্ষম হবেন, এবং তাঁর এই শরশয্যায় শয়ন তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারেই হয়েছিল। মহান যোদ্ধার এই প্রয়াণ তৎকালীন

সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, এবং তাঁরা সকলে সেই মহাত্মার প্রতি তাঁদের প্রেম, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ প্রদর্শন করার জন্য সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

তদা তে ভ্রাতরঃ সর্বে সদশ্বৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ ।
অন্বগচ্ছন্ রথৈর্বিপ্রা ব্যাসধৌম্যাদয়স্তথা ॥ ২ ॥

তদা—সেই সময়ে; **তে**—তাঁরা সকলে; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতারা; **সর্বে**—সকলে একসঙ্গে; **সৎ-অশ্বৈঃ**—উত্তম অশ্বদের দ্বারা চালিত; **স্বর্ণ**—স্বর্ণ; **ভূষিতৈঃ**—ভূষিত হয়ে; **অন্বগচ্ছন্**—একে অপরকে অনুসরণ করে; **রথৈঃ**—রথের উপরে; **বিপ্রাঃ**—হে বিপ্রগণ; **ব্যাস**—ব্যাসমুনি; **ধৌম্য**—ধৌম্য; **আদয়ঃ**—আদি; **তথা**—ও।

অনুবাদ

সেই সময়ে তাঁর সমস্ত ভ্রাতারা স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত উত্তম অশ্বদের চালিত অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর রথে আরোহণ করে তাঁর অনুগমন করলেন। তাঁদের সঙ্গে ব্যাসদেব, পাণ্ডবদের প্রধান পুরোহিত ধৌম্যের মতো ঋষিরা এবং অন্যেরা ছিলেন।

শ্লোক ৩

ভগবানপি বিপ্রর্ষে রথেন সধনঞ্জয়ঃ ।
স তৈর্ব্যরোচত নৃপঃ কুবের ইব গুহ্যকৈঃ ॥ ৩ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ); **অপি**—ও; **বিপ্র-ঋষে**—হে বিপ্রর্ষি; **রথেন**—রথের উপরে; **সধনঞ্জয়ঃ**—ধনঞ্জয়ের (অর্জুন) সঙ্গে; **সঃ**—তিনি; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **ব্যরোচত**—আভিজাত্যসম্পন্ন; **নৃপঃ**—রাজা (যুধিষ্ঠির); **কুবের**—কুবের, দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ; **ইব**—যেমন; **গুহ্যকৈঃ**—গুহ্যক নামক সঙ্গী।

অনুবাদ

হে বিপ্রর্ষি, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের সঙ্গে একটি রথে চড়ে তাঁদের অনুগমন করলেন। এইভাবে যুধিষ্ঠির মহারাজকে অত্যন্ত আভিজাত্যসম্পন্ন বলে মনে হতে লাগল, ঠিক যেমন কুবেরকে গুহ্যক আদি সঙ্গী পরিবৃত অবস্থায় মনে হয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে পাণ্ডবেরা যেন অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণভাবে ভীষ্মদেবের সম্মুখে উপস্থিত হন যাতে তিনি তাঁর অন্তিম সময়ে তাঁদের সুখী দেখে প্রসন্ন হতে পারেন। কুবের সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সবচাইতে ধনবান, এবং এখানে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কুবেরের মতো মনে হয়েছে, কেননা শ্রীকৃষ্ণ সহ সেই শোভাযাত্রা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজপদের উপযুক্ত ছিল।

শ্লোক ৪

দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ দিবশ্চ্যুতমিবামরম্ ।
প্রণেমুঃ পাণ্ডবা ভীষ্মং সানুগাঃ সহ চক্রিণা ॥ ৪ ॥

দৃষ্ট্বা—এইভাবে দর্শন করে; **নিপতিতম্**—শায়িত; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **দিবঃ**—আকাশমার্গ থেকে; **চ্যুতম্**—চ্যুত; **ইব**—মতো; **অমরম্**—দেবতা; **প্রণেমুঃ**—প্রণত হয়েছিলেন; **পাণ্ডবাঃ**—পাণ্ডুপুত্রেরা; **ভীষ্মম্**—ভীষ্মের কাছে; **স-অনুগাঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের; **সহ**—সঙ্গে; **চক্রিণা**—চক্রধারী ভগবান।

অনুবাদ

আকাশমার্গ থেকে বিচ্যুত এক দেবতার মতো তাঁকে (ভীষ্মদেবকে) ভূমিতে শায়িত দেখে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ (মামাতো) ভ্রাতা এবং অর্জুনের অন্তরঙ্গ সখা। কিন্তু পাণ্ডব পরিবারের সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতেন। ভগবানও তাঁর পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকা সত্ত্বেও সর্বদা একজন মানুষের মতো আচরণ করতেন, এবং তাই তিনিও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতো মৃত্যুপথযাত্রী ভীষ্মদেবের সম্মুখে প্রণত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

তত্র ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে দেবর্ষয়শ্চ সত্তম ।
রাজর্ষয়শ্চ তত্রাসন্ দ্রষ্টুং ভরতপুঙ্গবম্ ॥ ৫ ॥

তত্র—সেখানে; **ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ**—ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা ঋষি; **সর্বে**—সকলে; **দেব-ঋষয়ঃ**—দেবতাদের মধ্যে যাঁরা ঋষি; **চ**—এবং; **সত্ত্বম**—সত্ত্বগুণে স্থিত; **রাজ-ঋষয়ঃ**—রাজন্যবর্গের মধ্যে যাঁরা ঋষি; **চ**—এবং; **তত্র**—সেইস্থানে; **আসন্**—উপস্থিত ছিলেন; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **ভরত**—ভরত মহারাজের বংশধরেরা; **পুঙ্গবম্**—প্রধান।

অনুবাদ

ভরত মহারাজের বংশধরগণের মধ্যে যিনি ছিলেন প্রধান, সেই ভীষ্মদেবকে দর্শন করার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহাত্মারা, অর্থাৎ সত্ত্বগুণে স্থিত দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ঋষি হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা পারমার্থিক উপলব্ধির মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এই প্রকার পারমার্থিক উপলব্ধি রাজা অথবা ভিক্ষুক নির্বিশেষে সকলেই লাভ করতে পারে। ভীষ্মদেব নিজেও একজন ব্রহ্মর্ষি ছিলেন এবং মহারাজ ভরতের বংশধরগণের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান। সমস্ত ঋষিরাই সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। সেই মহান যোদ্ধার আসন্ন মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁরা সকলে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬-৭

পর্বতো নারদো ধৌম্যো ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।
বৃহদশ্বো ভরদ্বাজঃ সশিষ্যো রেণুকাসুতঃ ॥ ৬ ॥
বশিষ্ঠ ইন্দ্রপ্রমদস্ত্রিতো গৃৎসমদোঽসিতঃ ।
কক্ষীবান্ গৌতমোঽত্রিশ্চ কৌশিকোঽথ সুদর্শনঃ ॥ ৭ ॥

পর্বতঃ—পর্বতমুনি; **নারদঃ**—নারদমুনি; **ধৌম্যঃ**—ধৌম্য; **ভগবান্**—ভগবদাবতার; **বাদরায়ণঃ**—ব্যাসদেব; **বৃহদশ্বঃ**—বৃহদশ্ব; **ভরদ্বাজঃ**—ভরদ্বাজ; **সশিষ্যঃ**—সশিষ্য; **রেণুকা-সুতঃ**—পরশুরাম; **বশিষ্ঠঃ**—বশিষ্ঠ; **ইন্দ্রপ্রমদঃ**—ইন্দ্রপ্রমদ; **ত্রিতঃ**—ত্রিত; **গৃৎসমদঃ**—গৃৎসমদ; **অসিতঃ**—অসিত; **কক্ষীবান্**—কক্ষীবান; **গৌতমঃ**—গৌতম; **অত্রিঃ**—অত্রি; **চ**—এবং; **কৌশিকঃ**—কৌশিক; **অথ**—এবং; **সুদর্শনঃ**—সুদর্শন।

অনুবাদ

সেখানে পর্বতমুনি, নারদমুনি, ধৌম্য, ভগবদাবতার ব্যাসদেব, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, পরশুরাম ও তাঁর শিষ্যবর্গ, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ, অসিত, কক্ষীবান, গৌতম, অত্রি, কৌশিক এবং সুদর্শনের মতো মহান মুনি-ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন।

তাৎপর্য

পর্বতমুনি প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে অন্যতম বলেই বিবেচিত হন। তিনি প্রায় সর্বদাই নারদ মুনির নিত্যসঙ্গী। তাঁরাও মহাকাশচারী এবং কোন প্রকার জড় যানের সাহায্য ছাড়াই তাঁরা শূন্যে বিচরণ করতে সক্ষম। পর্বত মুনিও নারদ মুনির মতো একজন দেবর্ষি অর্থাৎ দেবগণের মধ্যে এক মহামুনি। মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র মহারাজ জনমেজয়ের যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি নারদ মুনির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত সর্পসমূহকে বিনাশ করার জন্য এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। পর্বত মুনি এবং নারদ মুনিকে গন্ধর্বও বলা হয়, কারণ ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে তাঁরা মহাকাশে বিচরণ করেন। শূন্যে বিচরণকালে তাঁরা উপর থেকে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নারদ মুনির মতো পর্বত মুনিও স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের রাজসভায় গমন করতেন। গন্ধর্বরূপে তিনি কখনো কখনো অন্যতম প্রধান দেবতা কুবেরের রাজসভাও পরিদর্শন করতেন। নারদ মুনি এবং পর্বত মুনি উভয়েই একবার মহারাজ সৃঞ্জয়ের কন্যার কাছে বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। মহারাজ সৃঞ্জয় পর্বত মুনির কাছ থেকে একটি পুত্র সন্তান লাভ করার বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

নারদ মুনি পুরাণের বর্ণনাদির সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* তাঁর বর্ণনা আছে। তাঁর পূর্ব জন্মে তিনি ছিলেন এক দাসীপুত্র, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদের সৎসঙ্গের প্রভাবে তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন, এবং পরবর্তী জীবনে তিনি একজন অদ্বিতীয় সিদ্ধ ব্যক্তি হন, যাঁর তুলনা ছিলেন তিনি নিজেই। মহাভারতে বহু স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি প্রধান দেবর্ষি, অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে প্রধান ঋষি। তিনি ব্রহ্মার পুত্র ও শিষ্য, এবং ব্রহ্মা থেকে গুরু-পরম্পরা তাঁর মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ এবং অনেক প্রসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের দীক্ষা প্রদান করেছিলেন। তিনি বৈদিক শাস্ত্রাদির প্রণেতা ব্যাসদেবকেও দীক্ষা প্রদান করেছিলেন, এবং ব্যাসদেবের কাছ থেকে মধ্বাচার্য দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং এইভাবে মধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রসার লাভ করেছে যে গৌড়ীয় সম্প্রদায় তা এই মধ্ব-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; সেইজন্য ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস থেকে শুরু করে মধ্ব, শ্রীচৈতন্য এবং গোস্বামীবর্গের সকলেই গুরু-পরম্পরায় একই ধারার অন্তর্গত।

ধৌম্য ঃ একজন মহান ঋষি, যিনি উৎকোচক তীর্থে কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং পাণ্ডব রাজাদের রাজপুরোহিতরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের বহু সংস্কার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন, এবং দ্রৌপদীকে বাগ্‌দানের সময় তিনি প্রত্যেক পাণ্ডবের সঙ্গে ছিলেন। পাণ্ডবদের বনবাসকালেও তিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁরা যখন কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি তাঁদের উপদেশ দিতেন। এক বছর অজ্ঞাতবাসকালে কিভাবে বসবাস করতে হবে সে সম্বন্ধে তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং সেই সময় পাণ্ডবেরা তাঁর নির্দেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সাধারণ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদনকালেও তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। *মহাভারতের* অনুশাসন পর্বে (১২৭/১৫-১৬) তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত বিশদভাবে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি গৃহস্থদের জন্য আদর্শ পুরোহিত, কেননা তিনি পাণ্ডবদের ধর্মের আদর্শ পথে পরিচালিত করেছিলেন। পুরোহিতের কর্তব্য হচ্ছে আশ্রম ধর্মের পথে গৃহস্থদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করা। প্রকৃতপক্ষে কুল পুরোহিত এবং গুরুদেবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ঋষি, মহাত্মা এবং ব্রাহ্মণদের সেইটিই হচ্ছে বিশেষ কর্তব্য।

বাদরায়ণ (ব্যাসদেব) ঃ তিনি কৃষ্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, দ্বৈপায়ন, সত্যবতীসুত, পরাশর্য, পরাশরাত্মজ, বাদরায়ণ, বেদব্যাস ইত্যাদি নামে পরিচিত। মহারথী পিতামহ ভীষ্মের পিতৃদেব মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে সত্যবতীর গর্ভে মহামুনি পরাশরের পুত্ররূপে তাঁর জন্ম হয়। তিনি নারায়ণের শক্ত্যাবেশ অবতার, এবং তিনি বৈদিক জ্ঞান পৃথিবীতে প্রচার করেন। তাই বৈদিক শাস্ত্র, বিশেষ করে পুরাণ পাঠ করার পূর্বে ব্যাসদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শুকদেব গোস্বামী ছিলেন তাঁর পুত্র, এবং বৈশম্পায়ন আদি ঋষিরা বেদের বিভিন্ন শাখায় তাঁর শিষ্য। তিনি মহাকাব্য মহাভারত এবং মহান পারমার্থিক গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেন। *ব্রহ্মসূত্র — বেদান্ত-সূত্র* বা *বাদরায়ণ সূত্র* তিনি প্রণয়ন করেন। তাঁর কঠোর তপস্যার প্রভাবে তিনি সমস্ত ঋষিদের মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত শাস্ত্র-প্রণেতারূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কলিযুগের মানুষদের কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি যখন মহাকাব্য মহাভারত লিপিবদ্ধ করার সংকল্প করেন, তখন তিনি একজন দক্ষ লেখকের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যিনি তাঁর বর্ণনা অনুসারে তা লিখতে সক্ষম হবেন।

তখন ব্রহ্মার নির্দেশে গণেশ সেই কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন একটি শর্তে যে ব্যাসদেব মুহূর্তের জন্যও তাঁর বর্ণনা থামাবেন না। এইভাবে ব্যাসদেব এবং গণেশের যৌথ প্রচেষ্টায় মহাভারত রচিত হয়েছিল।

তাঁর মাতা সত্যবতীর, যিনি পরে মহারাজ শান্তনুকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁর আদেশ এবং শান্তনুর প্রথমা পত্নী গঙ্গার গর্ভজাত পুত্র ভীষ্মদেবের অনুরোধে তিনি ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর নামক তিনটি অত্যন্ত উজ্জ্বল সন্তান উৎপাদন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এবং সেই যুদ্ধে সমস্ত মহান যোদ্ধাদের মৃত্যুর পর ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র মহারাজ জনমেজয়ের রাজসভায় তা প্রথম পাঠ করা হয়েছিল।

বৃহদশ্ব ঃ একজন প্রাচীন ঋষি যিনি প্রায়শই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় কাম্যবনে। এই ঋষি মহারাজ নলের ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন। আর একজন *বৃহদশ্ব* রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন ইক্ষ্বাকু বংশের সন্তান (*মহাভারত* বন পর্ব ২০৯/৪-৫)।

ভরদ্বাজ ঃ সপ্তর্ষিদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন অন্যতম এবং অর্জুনের জন্মোৎসবের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই মহা শক্তিশালী ঋষি গঙ্গার তটে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং প্রয়াগ ধামে তাঁর আশ্রম এখনও রয়েছে। কথিত আছে যে এক সময় গঙ্গাস্নানকালে ঘৃতচী নামক স্বর্গের এক অপ্সরার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁর স্খলিত বীর্য একটি মৃৎপাত্রে রাখা হয় এবং তার থেকে দ্রোণের জন্ম হয়। এইভাবে দ্রোণাচার্য হচ্ছেন ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। অন্য অনেকে বলেন যে দ্রোণাচার্যের পিতা ভরদ্বাজ মহর্ষি ভরদ্বাজ থেকে ভিন্ন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মার একজন মহান ভক্ত। এক সময় তিনি দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে তাঁকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন।

পরশুরাম বা রেণুকাসুত ঃ ইনি মহর্ষি জমদগ্নি এবং শ্রীমতী রেণুকার পুত্র। সেই সূত্রে তিনি রেণুকাসুত নামেও পরিচিত। তিনি ভগবানের একজন শক্ত্যাবেশ অবতার, এবং তিনি একুশ বার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করেছিলেন। ক্ষত্রিয়দের রক্তে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের আত্মার প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। তারপর তিনি মহেন্দ্র পর্বতে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ক্ষত্রিয়দের কাছ থেকে পৃথিবী ছিনিয়ে নিয়ে তিনি তা কশ্যপ মুনিকে দান করেছিলেন। পরশুরাম দ্রোণাচার্যকে *ধনুর্বেদ* বা সামরিক বিজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন, কেননা তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে সেই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পরশুরাম এতই প্রাচীন যে বিভিন্ন যুগে রাম এবং কৃষ্ণ উভয়ের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছিলেন। তিনি যখন অর্জুনকে কৃষ্ণের সঙ্গে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। ভীষ্ম যখন অম্বাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন, তখন ভীষ্মকে পতিরূপে লাভ করতে আকাঙ্ক্ষী অম্বা পরশুরামের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং তার অনুরোধে তিনি ভীষ্মদেবকে বলেন অম্বাকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করতে। ভীষ্ম তাঁর সেই আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন, যদিও তিনি ছিলেন ভীষ্মদেবের গুরুদেব। তাঁর সতর্কবাণী উপেক্ষা করার জন্য পরশুরাম তখন ভীষ্মদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রবল সংগ্রাম হয়েছিল, এবং অবশেষে পরশুরাম ভীষ্মের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হবেন।

বশিষ্ঠ ঃ ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত ঋষি, যিনি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব নামে পরিচিত। *রামায়ণ* এবং *মহাভারতের* উভয় কালেই তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক উৎসব তিনি অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমস্ত উচ্চলোক এবং অধঃলোকে গমনাগমন করতে পারতেন, এবং তাঁর নাম হিরণ্যকশিপুর ইতিহাসের সঙ্গেও যুক্ত। বিশ্বামিত্র তাঁর কামধেনু বলপূর্বক অধিকার করতে চাইলে তাঁদের মধ্যে বিবাদ হয়। বশিষ্ঠ মুনি তাঁকে কামধেনু দিতে অস্বীকার করেন, এবং তাই বিশ্বামিত্র তাঁর একশত পুত্রকে হত্যা করেন। আদর্শ ব্রাহ্মণরূপে তিনি বিশ্বামিত্রের সমস্ত উপহাস সহ্য করেন। বিশ্বামিত্রের নির্যাতনের ফলে এক সময় তিনি আত্মহত্যা করতে চান, কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি একটি পাহাড় থেকে লাফ দেন, কিন্তু যে পাথরের উপর তিনি পড়েছিলেন সেগুলি তুলার স্তূপে পরিণত হয় এবং তার ফলে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, কিন্তু ঢেউগুলি তাঁকে তীরে নিয়ে আসে। তিনি নদীতে ডুব দেন, কিন্তু নদীও তাঁকে তীরে নিয়ে আসে। এইভাবে তাঁর আত্মহত্যা করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনিও সপ্তর্ষিদের মধ্যে অন্যতম এবং সুপ্রসিদ্ধ-নক্ষত্র অরুন্ধতীর পতি।

ইন্দ্রপ্রমদ ঃ আর একজন বিখ্যাত ঋষি।

ত্রিত ঃ প্রজাপতি গৌতমের তিন পুত্রের অন্যতম। তিনি ছিলেন তৃতীয় পুত্র, এবং তাঁর অন্য দুই ভ্রাতার নাম একৎ এবং দ্বিত। তাঁরা তিন ভ্রাতাই ছিলেন মহর্ষি এবং ধর্মীয় অনুশাসনে নিষ্ঠাপরায়ণ। কঠোর তপস্যার প্রভাবে তাঁরা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। এক সময় ত্রিত মুনি একটি কূপে পতিত হন। তিনি বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা

ছিলেন, এবং একজন মহর্ষিরূপে তিনিও ভীষ্মজীর অন্তিম সময়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি বরুণলোকের সপ্তর্ষিদের মধ্যে একজন। তিনি পৃথিবীর পাশ্চাত্য দেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন, খুব সম্ভবত তিনি ইউরোপের অধিবাসী ছিলেন। সেই সময় সারা পৃথিবী জুড়ে বৈদিক সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল।

গৃৎসমদ ঃ স্বর্গের ঋষিদের অন্যতম। তিনি ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বৃহস্পতির মতোই মহান। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় প্রায়ই যেতেন, এবং যে স্থানে ভীষ্মদেব তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেখানেও তিনি গিয়েছিলেন। কোন এক সময়ে তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে দেবাদিদেব মহাদেবের মহিমা বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিতহব্যের পুত্র, এবং তাঁর অবয়ব ঠিক ইন্দ্রের মতো ছিল। এক সময় ইন্দ্রের শত্রুরা তাঁকে ইন্দ্র বলে মনে করে বন্দী করেছিল। তিনি ছিলেন ঋগ্বেদের একজন মহান পণ্ডিত, এবং তার ফলে ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী, এবং তিনি সর্বতোভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন।

অসিত ঃ এই নামের একজন রাজাও ছিলেন, কিন্তু এখানে যে অসিতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন অসিত দেবল ঋষি, সেই সময়কার একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ঋষি। তিনি তাঁর পিতার কাছে মহাভারতের পনের লক্ষ শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছিলেন। মহারাজ জনমেজয়ের সর্পনিধন যজ্ঞে তিনি উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময়ও তিনি অন্যান্য মহর্ষিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন অঞ্জন পর্বতে ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে উপদেশও দান করেছিলেন। তিনি একজন শিবভক্তও ছিলেন।

কক্ষীবান ঃ গৌতম মুনির পুত্রদের অন্যতম এবং মহর্ষি চন্দকৌশিকের পিতা। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রিমণ্ডলীর একজন সদস্য ছিলেন।

অত্রি ঃ অত্রি মুনি ছিলেন একজন মহান ব্রহ্মর্ষি এবং ব্রহ্মার মানস-পুত্রদের অন্যতম। ব্রহ্মাজী এতই শক্তিশালী যে তিনি কেবল চিন্তা করার মাধ্যমে পুত্র উৎপন্ন করতে পারেন। ব্রহ্মার এই পুত্রদের বলা হয় মানস-পুত্র। ব্রহ্মার সাতজন মানস-পুত্র এবং সাতজন ব্রহ্মর্ষির মধ্যে অত্রিও হচ্ছেন একজন। তাঁর পরিবারে মহান প্রচেতাদেরও জন্ম হয়েছিল। অত্রি মুনির দুজন ক্ষত্রিয় পুত্র ছিলেন, যাঁরা রাজা হয়েছিলেন। রাজা অর্থমও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। একুশজন প্রজাপতির মধ্যে তাঁকে গণনা করা হয়ে থাকে। তাঁর পত্নীর নাম অনসূয়া। মহারাজ পরীক্ষিতের মহাযজ্ঞে তিনি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

কৌশিক ঃ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভার স্থায়ী সদস্য ঋষিদের অন্যতম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই নামে আরও কয়েকজন ঋষি রয়েছেন।

সুদর্শন ঃ পরমেশ্বর ভগবানের (বিষ্ণু বা কৃষ্ণের) এক মহা শক্তিশালী অস্ত্র। এই সুদর্শন চক্র ব্রহ্মাস্ত্র বা অন্য যে কোন ধ্বংসাত্মক অস্ত্র থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। কোন কোন বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে অগ্নিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই অস্ত্রটি দান করেন, কিন্তু বস্তুত ভগবান নিত্যকাল যাবৎ এই অস্ত্রটি ধারণ করে থাকেন। মহারাজ রুক্ম যেভাবে ভগবানের হস্তে রুক্মিণীকে অর্পণ করেছিলেন, তেমনই অগ্নিদেবও শ্রীকৃষ্ণকে এই অস্ত্রটি দান করেছিলেন। ভগবান তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে এইভাবে উপহার গ্রহণ করেন, যদিও সেই সমস্ত উপহারগুলি তাঁর নিত্য সম্পত্তি। *মহাভারতের* আদি-পর্বে এই অস্ত্রটির সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শিশুপালকে বধ করার সময় এই অস্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি শাল্বকেও এই অস্ত্রের দ্বারা সংহার করেন। কখনো কখনো তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর সখা অর্জুনও তাঁর শত্রুদের সংহার করার জন্য তা ব্যবহার করুন (*মহাভারত, বিরাট পর্ব ৫৬/৩*)।

শ্লোক ৮

অন্যে চ মুনয়ো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মরাতাদয়োঽমলাঃ।
শিষ্যৈরুপেতা আজগ্মুঃ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্যে—অন্য অনেকে; **চ**—ও; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ব্রহ্মরাত**—শুকদেব গোস্বামী; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি; **অমলাঃ**—সম্পূর্ণভাবে নির্মল; **শিষ্যৈঃ**—শিষ্যগণ কর্তৃক; **উপেতাঃ**—পরিবৃত হয়ে; **আজগ্মুঃ**—এসেছিলেন; **কশ্যপ**—কশ্যপ; **আঙ্গিরস**—আঙ্গিরস; **আদয়ঃ**—এবং অন্য অনেকে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, এছাড়া শুকদেব আদি অমল পরমহংসগণ, এবং কশ্যপ ও আঙ্গিরস প্রমুখ মুনিগণ তাঁদের নিজ নিজ শিষ্য পরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী (ব্রহ্মরাত) ঃ শ্রীব্যাসদেবের বিখ্যাত পুত্র এবং শিষ্য, যাঁকে তিনি প্রথমে *মহাভারত* এবং তারপর *শ্রীমদ্ভাগবত* শিক্ষা দিয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী

গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের সভায় চৌদ্দ লক্ষ শ্লোক সমন্বিত *মহাভারত* শুনিয়েছিলেন, এবং তিনি মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে সর্বপ্রথম *শ্রীমদ্ভাগবত* কীর্তন করেছিলেন। তিনি তাঁর মহান পিতার কাছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। এইভাবে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত জ্ঞানের প্রভাবে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আত্মা। *মহাভারতের* সভা-পর্ব (৪/১১) থেকে জানা যায় যে তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় এবং মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের সময় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীব্যাসদেবের প্রকৃত শিষ্যরূপে তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে ধর্ম-তত্ত্ব এবং পারমার্থিক মূল্য সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রশ্ন করেছিলেন, এবং তাঁর মহান পিতাও তাঁকে যে যোগ-পদ্ধতির দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন, এবং সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের পার্থক্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন; পারমার্থিক উপলব্ধির পন্থা, চতুরাশ্রম (যথা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস), পরমেশ্বর ভগবানের পরম পদ এবং তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার পন্থা, জ্ঞান লাভের উপযুক্ত পাত্র, পঞ্চ-তত্ত্ব, বুদ্ধির অলৌকিক স্থিতি, জড়া প্রকৃতির চেতনা এবং জীব-তত্ত্ব স্বরূপ-সিদ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ, জড় শরীরের ধর্ম, প্রকৃতির গুণের লক্ষণ, নিরন্তর বাসনার বৃক্ষ এবং মনের কার্যকলাপ আদি বিষয়েও তিনি তাঁকে শিক্ষা দেন। এক সময় তাঁর পিতা এবং নারদ মুনির অনুমতি নিয়ে তিনি সূর্যলোকে গমন করেছিলেন। *মহাভারতের* শান্তি পর্বে (৩৩২) তাঁর অন্তরীক্ষে ভ্রমণের বর্ণনা রয়েছে। অবশেষে তিনি ভগবানের চিন্ময় ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি অরণেয়, অরুণিসুত, বৈয়াসকি, ব্যাসাত্মজ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

কশ্যপ ঃ একজন প্রজাপতি, মরীচির পুত্র এবং দক্ষের জামাতা। হাতি এবং কচ্ছপ যাঁর খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয়েছিল সেই বিশাল পক্ষী গরুড়ের তিনি পিতা। তিনি প্রজাপতি দক্ষের তেরজন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, এবং তাঁদের নাম হচ্ছে অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা এবং তিমি। সেই সমস্ত পত্নীদের মাধ্যমে তিনি দেব, অসুর আদি বহু সন্তানের জন্ম দেন। তাঁর প্রথম পত্নী অদিতি থেকে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়; তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ভগবানের অবতার বামন। এই মহর্ষি কশ্যপ অর্জুনের জন্মের সময়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরশুরামের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ সমগ্র বিশ্ব প্রাপ্ত হন এবং পরে তিনি পরশুরামকে এই বিশ্ব থেকে চলে যেতে বলেন। তাঁর অন্য আর একটি নাম হচ্ছে অরিষ্টনেমি। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরভাগে বাস করেন।

আঙ্গিরস ঃ মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র, এবং তিনি দেবগুরু বৃহস্পতি নামে পরিচিত। কথিত হয় যে দ্রোণাচার্য তাঁর অংশ অবতার। বৃহস্পতি এক সময় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিলেন। কচ হচ্ছে তাঁর পুত্র, এবং তিনি ভরদ্বাজ মুনিকে প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র দান করেন। তিনি তাঁর পত্নী বিখ্যাত নক্ষত্রদের মধ্যে অন্যতমা চন্দ্রমাসীর গর্ভে (অগ্নিদেবের মতো) ছয় পুত্র উৎপাদন করেন। তিনি অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করতে পারতেন, এবং তাই তিনি ব্রহ্মলোক এবং ইন্দ্রলোকেও গমন করতে পারতেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে অসুরদের পরাভূত করার বিষয়ে উপদেশ দেন। এক সময় তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, যার ফলে ইন্দ্র এই পৃথিবীতে শূকর যোনি প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গলোকে ফিরে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। মায়ার আকর্ষণের এমনই প্রভাব যে একটি শূকর পর্যন্ত স্বর্গলোকের বিনিময়েও এই পৃথিবীর আসক্তি ত্যাগ করতে চায় না। তিনি বিভিন্ন লোকের অধিবাসীদের ধর্মগুরু।

শ্লোক ৯

তান্ সমেতান্মহাভাগানুপলভ্য বসূত্তমঃ ।
পূজয়ামাস ধর্মজ্ঞো দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৯ ॥

তান্—তাঁরা সকলে; **সমেতান্**—সমবেত হয়েছিলেন; **মহা-ভাগান্**—মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণ; **উপলভ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **বসু-উত্তমঃ**—বসুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ভীষ্মদেব); **পূজয়াম্-আস**—অভিবাদন করেছিলেন; **ধর্মজ্ঞঃ**—ধর্মতত্ত্ববেত্তা; **দেশ**—স্থান; **কাল**—সময়; **বিভাগ-বিৎ**—স্থান ও কালের বিভাগ অনুসারে কার্য সম্পাদনে দক্ষ।

অনুবাদ

ধর্মতত্ত্ববেত্তা, দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কার্য সম্পাদনে দক্ষ, অষ্টবসুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব সেই সমস্ত মহাপ্রভাবশালী ঋষিদের সেখানে উপস্থিত দেখে যথাযথভাবে তাঁদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন।

তাৎপর্য

সুদক্ষ ধর্মতত্ত্ববিদেরা জানেন কিভাবে দেশ এবং কাল অনুসারে ধর্মনীতির সমন্বয় সাধন করতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত মহান আচার্য অথবা ধর্ম-প্রচারক বা ধর্ম-সংস্কারকেরা স্থান এবং কাল অনুসারে ধর্মনীতির সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পাদন করেছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও পরিস্থিতি রয়েছে, এবং কাউকে যদি ভগবানের বাণী প্রচার করতে হয়, তাহলে

তাকে অবশ্যই দেশ এবং কাল অনুসারে সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে অত্যন্ত দক্ষ হতে হবে। ভগবদ্ভক্তির প্রচারকারী এই সম্প্রদায়ের দ্বাদশ মহাজনদের মধ্যে ভীষ্মদেব হচ্ছেন অন্যতম, এবং তাই তাঁর মৃত্যুশয্যায় ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সমস্ত মহাশক্তিশালী ঋষিদের তিনি স্বাগত জানাতে এবং অভ্যর্থনা করতে পেরেছিলেন। তাঁদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে এবং আপ্যায়ন করতে তিনি দৈহিক ভাবে অবশ্যই অক্ষম ছিলেন, কেননা তিনি তখন তাঁর গৃহে ছিলেন না, অথবা স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ছিলেন না। কিন্তু তাঁর দৃঢ় মনের কার্যকলাপ ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ, এবং তাই তিনি আন্তরিক ভাব প্রকাশের মাধ্যমে তাঁদের মধুর সম্ভাষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরা সকলেই সাদরে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। মানুষ তাঁর মন, বাণী এবং কর্মের দ্বারা তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে। তিনি ভালভাবেই জানতেন উপযুক্ত স্থানে কিভাবে তাদের সদ্ব্যবহার করতে হয়। তাই শারীরিক দিক দিয়ে অসমর্থ হলেও তাঁদের সৎকার করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি।

শ্লোক ১০

কৃষ্ণঞ্চ তৎপ্রভাবজ্ঞ আসীনং জগদীশ্বরম্ ।
হৃদিস্থং পূজয়ামাস মায়য়োপাত্তবিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণম্—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে; **চ**—ও; **তৎ**—তাঁর; **প্রভাবজ্ঞঃ**—মহিমা সম্বন্ধে অবগত (ভীষ্ম); **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **জগৎ-ঈশ্বরম্**—জগৎপতি; **হৃদি-স্থম্**—হৃদয়ে অবস্থিত; **পূজয়াম্-আস**—পূজা করেছিলেন; **মায়য়া**—অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে; **উপাত্ত**—প্রকাশ করেছিলেন; **বিগ্রহম্**—রূপ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তবুও তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিবলে নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশিত করে থাকেন। সেই পরমেশ্বরই ভীষ্মদেবের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন, এবং যেহেতু ভীষ্মদেব তাঁর মহিমা সম্বন্ধে অবগত তাই তিনি যথাযোগ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা প্রদর্শিত হয় সর্বস্থানে তাঁর উপস্থিতির দ্বারা। তিনি সর্বদাই তাঁর নিত্য ধাম গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, আবার একই সঙ্গে তিনি প্রতিটি

জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, এমনকি অদৃশ্য পরমাণুর মধ্যেও তিনি বিরাজ করেন। এই জড় জগতে যখন তিনি তাঁর নিত্য চিন্ময় রূপ প্রকাশ করেন তখন তিনি তা করেন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা। তাঁর নিত্য রূপের সঙ্গে বহিরঙ্গা শক্তি বা জড়া প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নেই। সেই সমস্ত তত্ত্ব ভীষ্মদেব জানতেন, তাই তিনি যথাযথভাবে তাঁর পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

পাণ্ডুপুত্রানুপাসীনান্ প্রশ্রয়প্রেমসঙ্গতান্।
অভ্যাচষ্টানুরাগাশ্রৈরন্ধীভূতেন চক্ষুষা ॥ ১১ ॥

পাণ্ডু-পুত্রান্—পাণ্ডবদের; **উপাসীনান্**—নিকটে নিঃশব্দে উপবিষ্ট; **প্রশ্রয়**—অভিভূত; **প্রেম**—প্রেমানুভূতি; **সঙ্গতান্**—সমবেত হয়ে; **অভ্যাচষ্ট**—অভিনন্দিত; **অনুরাগ**—অনুভূতি সহকারে; **অশ্রৈঃ**—প্রেমাশ্রুর দ্বারা; **অন্ধীভূতেন**—আচ্ছন্ন হয়েছিলেন; **চক্ষুষা**—চক্ষু দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রেরা তাঁদের মরণোন্মুখ পিতামহের প্রতি প্রীতিবশত অভিভূত হয়ে নিঃশব্দে কাছেই বসে ছিলেন। তাই দেখে ভীষ্মদেব ভাবাবেগে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। তাঁদের প্রতি প্রীতি এবং স্নেহের বশে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন বলে তাঁর চোখে ভাবোচ্ছ্বাসের অশ্রু দেখা দিল।

তাৎপর্য

মহারাজ পাণ্ডুর যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর সমস্ত পুত্রেরা ছিলেন শিশু, এবং তাই তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই রাজপরিবারের প্রবীণ সদস্যদের বিশেষ করে ভীষ্মদেবের স্নেহে পালিত হয়েছিলেন। পরে পাণ্ডবেরা যখন বড় হয়েছিলেন, তখন ধূর্ত দুর্যোধন এবং তার গোষ্ঠী তাঁদের প্রতারণা করে। পাণ্ডবেরা যে নির্দোষ ও অন্যায়ভাবে তাঁদের কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তা জানা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারেননি। তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে ভীষ্মদেব যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রমুখ তাঁর অত্যন্ত যশস্বী পৌত্রদের তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেছিলেন, তখন সেই মহান যোদ্ধা পিতামহ তাঁর প্রেমাশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তাঁর চোখ থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছিল। তাঁর অতি

পুণ্যবান পৌত্রদের মহা দুঃখ-দুর্দশার কথা তাঁর স্মরণ হয়েছিল। দুর্যোধনের পরিবর্তে যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে তিনি অবশ্যই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

অহো কষ্টমহোঽন্যায্যং যদ্যূয়ং ধর্মনন্দনাঃ।
জীবিতুং নার্হথ ক্লিষ্টং বিপ্রধর্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ ॥ ১২ ॥

অহো—হায়; **কষ্টম্**—কী ভীষণ দুঃখ-কষ্ট; **অহো**—আহা; **অন্যায্যম্**—কী ভীষণ অন্যায়; **যৎ**—তার ফলে; **যূয়ম্**—তোমরা পুণ্যাত্মারা; **ধর্ম-নন্দনাঃ**—ধর্ম-পুত্রেরা; **জীবিতুম্**—জীবন ধারণের জন্য; **ন**—না; **অর্হথ**—যোগ্য; **ক্লিষ্টম্**—দুঃখে জর্জরিত; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **ধর্ম**—পুণ্য; **অচ্যুত**—ভগবান; **আশ্রয়াঃ**—রক্ষিত হয়ে।

অনুবাদ

ভীষ্মদেব বললেন—হায়, সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র হওয়ার ফলে তোমরা কী ভীষণ দুঃখ-কষ্ট এবং কী ভীষণ অন্যায় আচরণ ভোগ করেছ। সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে তোমাদের জীবিত থাকার কথা নয়, তবুও ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ধর্মের দ্বারাই তোমরা সুরক্ষিত হয়েছিলে।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে ব্যাপক নরহত্যা হয়েছিল, সেজন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। ভীষ্মদেব তা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি প্রথমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভয়ঙ্কর দুঃখ-দুর্দশার কথা উল্লেখ করেছিলেন। অন্যায়ভাবে তাঁকে এই সমস্ত বিপদে ফেলা হয়েছিল, এবং সেই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ হয়েছিল। তাই সেই ব্যাপক হত্যার জন্য তাঁর অনুতাপ করার কোন কারণ ছিল না। তিনি পাণ্ডবদের বিশেষভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা সর্বদা ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ধর্মনীতির দ্বারা রক্ষিত ছিলেন। যতক্ষণ তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় দ্বারা রক্ষিত, ততক্ষণ তাঁদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। এইভাবে ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নৈরাশ্য দূর করার জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। যতক্ষণ মানুষ সদ্-ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ধর্মনীতির অনুসরণ করে, ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে পূর্ণরূপে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ

যত দুর্দশাই আসুক না কেন তাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। এই সম্প্রদায়ের একজন মহাজনরূপে ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের সে কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

সংস্থিতেঽতিরথে পাণ্ডৌ পৃথা বালপ্রজা বধূঃ ।
যুষ্মৎকৃতে বহূন্ ক্লেশান্ প্রাপ্তা তোকবতী মুহুঃ ॥ ১৩ ॥

সংস্থিতে—মৃত্যুর পর; **অতি-রথে**—মহারথী; **পাণ্ডৌ**—পাণ্ডুর; **পৃথা**—কুন্তী; **বাল-প্রজা**—শিশু সন্তানগণ; **বধূঃ**—আমার পুত্রবধূ; **যুষ্মৎকৃতে**—তোমাদের জন্য; **বহূন্**—বহুবিধ; **ক্লেশান্**—দুঃখ-কষ্ট; **প্রাপ্তা**—ভোগ করেছে; **তোক-বতী**—সাবালক পুত্রেরা থাকা সত্ত্বেও; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

মহারথী পাণ্ডুর মৃত্যুর পর আমার পুত্রবধূ কুন্তী বহু শিশু-সন্তানাদিসহ বিধবা হন, এবং সেইজন্য বহু দুঃখ-কষ্ট তিনি ভোগ করেন। আর যখন তোমরা বড় হয়ে উঠলে, তখনও তোমাদের কার্যকলাপের জন্য তাঁকে প্রভূত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।

তাৎপর্য

কুন্তীদেবীর দুঃখ-দুর্দশার জন্য দ্বিগুণ শোক প্রকাশ করা হয়েছে। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার ফলে এবং রাজপরিবারে তাঁর শিশুপুত্রদের লালন-পালন করতে গিয়ে তাঁকে ভীষণ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর পুত্ররা যখন বড় হয়, তখনও তাঁর পুত্রদের কার্যকলাপের জন্য তাঁকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। তার অর্থ হচ্ছে যে কষ্ট ভোগ করাই তাঁর ভাগ্যে ছিল। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বিচলিত না হয়ে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা।

শ্লোক ১৪

সর্বং কালকৃতং মন্যে ভবতাঞ্চ যদপ্রিয়ম্ ।
সপালো যদ্বশে লোকো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥ ১৪ ॥

সর্বম্—এই সমস্ত; **কাল-কৃতম্**—অনিবার্য কালের প্রভাবে সংঘটিত; **মন্যে**—আমি মনে করি; **ভবতাম্ চ**—তোমাদের জন্যও; **যৎ**—যা; **অপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **স-পালঃ**—

লোকপালগণসহ; **যৎ-বশে**—সেই কালের বশবর্তী; **লোকঃ**—প্রতিটি গ্রহের প্রতিটি জীব; **বায়োঃ**—বায়ুর দ্বারা; **ইব**—মতো; **ঘন-আবলিঃ**—মেঘরাশি।

অনুবাদ

আমার মতে এই সবই ঘটেছে অনিবার্য কালের প্রভাবে, যার দ্বারা প্রতিটি গ্রহের প্রতিটি জীব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠিক যেমন মেঘরাশি বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সমস্ত গ্রহগুলি যেমন কালের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দেশও কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বড় বড় সমস্ত গ্রহগুলি এমনকি সূর্য পর্যন্ত বায়ুর শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ঠিক যেমন বায়ু মেঘকে বহন করে নিয়ে যায়। তেমনই কাল বায়ু এবং অন্যান্য উপাদানগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই সবকিছুই মহাকালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা হচ্ছে এই জড় জগতে ভগবানের শক্তিশালী এক প্রতিনিধি। তাই কালের অচিন্ত্য ক্রিয়ার প্রভাবে যা ঘটেছে তার জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজের দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল না। জড় জগতের বন্ধনে জীব যতক্ষণ আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে কালের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে হয়। যুধিষ্ঠির মহারাজের এমন মনে করা উচিত ছিল না যে পূর্ব জন্মে পাপ করার জন্য তাঁকে এই জন্মে তার ফল ভোগ করতে হয়েছিল। এমনকি সবচাইতে পুণ্যবান ব্যক্তিকেও পর্যন্ত জড়া-প্রকৃতির এই অবস্থা ভোগ করতে হয়। তবে পুণ্যবান ব্যক্তি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, কেননা, তিনি ধর্মনীতি-পরায়ণ সদ্ ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের দ্বারা পরিচালিত হন। এই তিনটি পথ-প্রদর্শক নীতিই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। শাশ্বত কালের মোহময়ী ক্রিয়ার দ্বারা কখনো বিচলিত হওয়া উচিত নয়। এমনকি ব্রহ্মার মতো ব্রহ্মাণ্ডের মহান নিয়ন্তা পর্যন্ত কালের নিয়ন্ত্রণাধীন; তাই ধর্মনীতির আদর্শ অনুসরণকারী হওয়া সত্ত্বেও এইভাবে কাল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ১৫

যত্র ধর্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ ।
কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎকৃষ্ণস্ততো বিপৎ ॥ ১৫ ॥

যত্র—যেখানে; **ধর্ম-সুতঃ**—ধর্মরাজের পুত্র; **রাজা**—নৃপতি; **গদা-পাণিঃ**—গদাধারী; **বৃকোদরঃ**—ভীম; **কৃষ্ণঃ**—অর্জুন; **অস্ত্রী**—অস্ত্রধারী; **গাণ্ডিবম্**—গাণ্ডিব; **চাপম্**—ধনুক; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ততঃ**—সেখানে; **বিপৎ**—বিপদ।

অনুবাদ

অনিবার্য কালের প্রভাব কি অদ্ভুত। এই প্রভাব অপরিবর্তনীয়—তা না হলে, ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে, গদাধারী মহাযোদ্ধা ভীমসেন ও শক্তিশালী অস্ত্র গাণ্ডীবধারী মহাধনুর্ধর অর্জুন যেখানে, এবং সর্বোপরি পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ সুহৃদ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে, সেখানে প্রতিকূলতা হয় কি করে?

তাৎপর্য

পাণ্ডবদের জাগতিক এবং পারমার্থিক সম্পদের কোন অভাব ছিল না। জাগতিক দিক দিয়ে তাঁরা সুসজ্জিত ছিলেন, কেননা তাঁদের মধ্যে ভীম এবং অর্জুনের মতো দুজন মহান যোদ্ধা ছিলেন। আর পারমার্থিক দিক দিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং ছিলেন ধর্মের মূর্তিমান প্রতীক এবং সর্বোপরি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে স্বয়ং তাঁদের জন্য চিন্তা করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পুণ্যবল, লোকবল, সুদক্ষ পরিচালনার বল এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অধ্যক্ষতায় অস্ত্রবল থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের বহু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল, যা একমাত্র কালের প্রভাব বলে বিশ্লেষণ করা যায়। কাল ভগবান থেকে অভিন্ন, এবং তাই কালের প্রভাব হচ্ছে ভগবানেরই অহৈতুকী ইচ্ছা। যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের অতীত, তা নিয়ে শোক করার কিছুই নেই।

শ্লোক ১৬

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্ ।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি ॥ ১৬ ॥

ন—না; **হি**—অবশ্যই; **অস্য**—তাঁর; **কর্হিচিৎ**—কোন; **রাজন্**—হে রাজন্; **পুমান্**—যে কেউ; **বেদ**—জানে; **বিধিৎসিতম্**—পরিকল্পনা; **যৎ**—যা; **বিজিজ্ঞাসয়া**—বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে; **যুক্তাঃ**—নিয়োজিত; **মুহ্যন্তি**—বিভ্রান্ত হন; **কবয়ঃ**—মহান্ দার্শনিকগণ; **অপি**—এমনকি; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

হে রাজন্, পরমেশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণের) পরিকল্পনা কেউই জানতে পারে না। এমনকি, মহান্ দার্শনিকেরাও বিশদ অনুসন্ধিৎসা সহকারে নিয়োজিত থেকেও কেবলই বিভ্রান্ত হন।

তাৎপর্য

তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্ম এবং তার ফলজনিত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিভ্রান্তি দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভীষ্মদেব কর্তৃক অনুমোদিত হয় নি। ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অনাদিকাল ধরে কেউই, এমনকি শিব এবং ব্রহ্মার মতো দেবতারাও ভগবানের প্রকৃত পরিকল্পনা নির্ণয় করতে পারেন নি। সুতরাং আমাদের পক্ষে তা বোঝা কি করে সম্ভব? সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাও নিরর্থক। এমনকি গভীর দার্শনিক অনুসন্ধানের মাধ্যমেও ঋষিগণ ভগবানের পরিকল্পনা নিশ্চিত রূপে নির্ণয় করতে পারেন না। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে কোনরকম যুক্তি-তর্ক না করে কেবল ভগবানের নির্দেশ পালন করে যাওয়া। পাণ্ডবদের দুঃখ-দুর্দশা কখনই তাঁদের পূর্বকৃত কর্মের জন্য হয় নি। ভগবানের পরিকল্পনা ছিল পৃথিবীতে ধর্মের সংস্থাপন করা, এবং তাই ধর্মের জয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর ভক্তদের সাময়িকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। ধর্মের জয় দর্শন করে ভীষ্মদেব অবশ্যই অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তিনি নিজে যদিও যুধিষ্ঠির মহারাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তথাপি তাঁকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। ভীষ্মদেবের মতো মহান্ যোদ্ধাও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন নি, কেননা ভগবান দেখাতে চেয়েছিলেন যে অধর্ম কখনো ধর্মকে পরাস্ত করতে পারে না, তা যেই সে চেষ্টা করুক না কেন। ভীষ্মদেব ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তিনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, কেননা ভগবান দেখাতে চেয়েছিলেন যে ভীষ্মদেবের মতো যোদ্ধাও ভুল পক্ষ অবলম্বন করলে জয়লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ১৭

তস্মাদিদং দৈবতন্ত্রং ব্যবস্য ভরতর্ষভ ।
তস্যানুবিহিতোঽনাথা নাথ পাহি প্রজাঃ প্রভো ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ইদম্**—এই; **দৈব-তন্ত্রম্**—দৈব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত; **ব্যবস্য**—নিশ্চিতভাবে; **ভরত-ঋষভ**—হে ভরতকুলতিলক; **তস্য**—তাঁর দ্বারা; **অনুবিহিতঃ**—ইচ্ছা অনুসারে; **অনাথাঃ**—অসহায়; **নাথ**—হে প্রভু; **পাহি**—পালন কর; **প্রজাঃ**—প্রজাদের; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে ভরতকুলতিলক (যুধিষ্ঠির), আমি তাই মনে করি যে এ সবই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্কল্পের অন্তর্গত। পরমেশ্বর ভগবানের অবিচিন্ত্য সঙ্কল্পকে স্বীকার করে নিয়ে তোমাকে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তুমি এখন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছ হে নাথ, এখন যারা অনাথ হয়েছে, সেই সব প্রজাদের যত্ন এবার তোমাকে নিতে হবে।

তাৎপর্য

একটি জনপ্রিয় প্রবাদে বলা হয় যে, শাশুড়ী নিজের কন্যাকে শেখানোর মাধ্যমে পুত্রবধূকে শিক্ষা দেন। তেমনই ভগবান তাঁর ভক্তকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সমগ্র জগতকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ভক্তকে ভগবানের কাছ থেকে নতুন করে কোনকিছু শিখতে হয় না, কেননা ভগবান তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে সর্বদা হৃদয় থেকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাই যখনই ভক্তকে শিক্ষা দেওয়ার অভিনয় করা হয়, যেমন *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে করা হয়েছিল, তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই করা হয়ে থাকে। তাই ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের দেওয়া সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে আশীর্বাদ বলে মনে করে অকুণ্ঠ চিত্তে তা গ্রহণ করা। ভীষ্মদেব পাণ্ডবদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন নির্দ্বিধায় শাসনভার গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে দীন-হীন প্রজারা অরক্ষিত ছিল, এবং তারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য গ্রহণের প্রতীক্ষা করছিল। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম, তাই ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে কোনরকম লৌকিক ভেদ নেই।

শ্লোক ১৮

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্ ।
মোহয়ন্মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু ॥ ১৮ ॥

এষঃ—এই; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **আদ্যঃ**—আদি; **নারায়ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান (যিনি জলে শয়ন করেন); **পুমান্**—পরম ভোক্তা পুরুষ; **মোহয়ন্**—বিমুগ্ধকর; **মায়য়া**—তাঁর নিজের সৃষ্ট মায়াশক্তির দ্বারা; **লোকম্**—বিশ্বচরাচর; **গূঢ়ঃ**—যাঁর মহিমা অবগত হওয়া সম্ভব নয়; **চরতি**—বিচরণ করেন; **বৃষ্ণিষু**—বৃষ্ণিকুলে।

অনুবাদ

এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অচিন্ত্য, আদি পুরুষ। তিনি আদি নারায়ণ, পরম ভোক্তা। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের সৃষ্ট মায়াশক্তির প্রভাবে আমাদের মুগ্ধ করে বৃষ্ণিকুলেরই একজনের মতো হয়ে তাঁদের মাঝে বিচরণ করছেন।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান অবরোহ পন্থায় আহরণ করা হয়। আচার্যদের কাছ থেকে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা ধারায় বৈদিক জ্ঞান এক আদর্শ পন্থায় আহরণ করা হয়। এই জ্ঞান কখনই কোন মতবাদ নয়, যা মূর্খ মানুষেরা অনেক সময় ভ্রান্তিবশত মনে করে থাকে। পিতার পরিচয় মাতাই সবচাইতে ভালভাবে দিতে পারেন। এই প্রকার গুহ্য জ্ঞানের তিনিই প্রকৃত অধিকারিণী। অতএব যথাযথ সূত্রে যে জ্ঞান লাভ হয় তা মতবাদ-মূলক নয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* চতুর্থ অধ্যায়ে (৪/২) সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। জ্ঞান আহরণের আদর্শ পন্থা হচ্ছে গুরু-পরম্পরা ধারায় তত্ত্বজ্ঞানী গুরুদেবের কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করা। সেই পদ্ধতি বিশ্বের সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে, কেবল মূর্খ তার্কিকেরাই তার বিরুদ্ধে বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে আধুনিক অন্তরীক্ষ-যান আকাশে উড়তে পারে, এবং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বলে যে তারা চাঁদের অপর পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছে তখন মানুষেরা তাদের সেই কাহিনী অন্ধের মতো বিশ্বাস করে, কেননা তারা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের এই বিষয়ে অধিকারী বলে স্বীকার করেছে। অধিকারীরা বলে, আর সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করে। কিন্তু বৈদিক সত্যের বিষয়ে, তাদের তা বিশ্বাস না করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আবার যদি বা তারা স্বীকারও করে, তাহলেও তার ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করে থাকে। প্রতিটি মানুষই প্রত্যক্ষভাবে বৈদিক জ্ঞান অনুভব করতে চায়, কিন্তু মূর্খতাবশত তারা তা অস্বীকার করে। তার অর্থ হচ্ছে যে বিপথে পরিচালিত মানুষেরা এক অধিকারীকে বিশ্বাস করে, এবং তারা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক; কিন্তু তারা বৈদিক প্রমাণ স্বীকার করতে চায় না। তার ফলে মানুষ অধঃপতিত হয়েছে।

এখানে একজন তত্ত্ববেত্তা মহাজন শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান এবং আদি নারায়ণ বলে নির্দেশ করছেন। শঙ্করাচার্যের মতো একজন নির্বিশেষবাদীও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে শুরুতে বলেছেন যে নারায়ণ, পরমেশ্বর ভগবান, জড় সৃষ্টি অতীত।

নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদ্ অণ্ডমব্যক্ত-সম্ভবম্ ।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ॥

(শঙ্কর-ভাষ্য-ভঃ গীঃ)

এই ব্রহ্মাণ্ড একটি জড় সৃষ্টি, কিন্তু নারায়ণ এই প্রকার ভৌতিক সৃষ্টির অতীত।

ভীষ্মদেব হচ্ছেন দিব্য জ্ঞানের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত দ্বাদশ মহাজনদের অন্যতম। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে আদি পরমেশ্বর ভগবান বলে প্রতিপন্ন করেছেন, তা নির্বিশেষবাদী শঙ্করাচার্য কর্তৃকও সমর্থিত হয়েছে। অন্য সমস্ত আচার্যেরাও এই উক্তি সমর্থন করেছেন, এবং তার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার না করার কোন অবকাশ নেই। ভীষ্মদেব বলেছেন যে তিনি হচ্ছেন আদি নারায়ণ। সে কথা ব্রহ্মাজীও *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/১৪) প্রতিপন্ন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি নারায়ণ। বৈকুণ্ঠলোকে অসংখ্য নারায়ণ রয়েছেন, যাঁরা সকলেই এক এবং অভিন্ন ভগবান, এবং তাঁরা আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বিস্তার হচ্ছেন বলদেব, এবং বলদেব থেকে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বাসুদেব, নারায়ণ, পুরুষ, রাম, নৃসিংহ আদি বহু রূপ প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত অংশ-প্রকাশই *বিষ্ণু-তত্ত্ব*, এবং শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত অংশ-প্রকাশের আদি উৎস। তাই তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবান। তিনি জড় জগতের স্রষ্টা এবং সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহস্বরূপ নারায়ণ। তাই মনুষ্য সমাজে তাঁর লীলা মোহজনক। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, মূর্খ মানুষেরা তাঁর পরম ভাব না জেনে তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মোহের কারণ হচ্ছে তাঁর তটস্থা নামক তৃতীয় শক্তির উপর অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা—এই দুই শক্তির ক্রিয়া। জীবেরা হচ্ছে তাঁর তটস্থা শক্তির প্রকাশ, এবং তার ফলে তারা কখনো তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা এবং কখনো বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিজনিত মোহের ফলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অসংখ্য নারায়ণরূপে প্রকাশ করে চিজ্জগতে জীবের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা স্বীকার করেন অথবা ভাব বিনিময় করেন। আর তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি বিস্তারের মাধ্যমে তিনি তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন যোনিসম্ভূত জীবদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য মনুষ্য, পশু অথবা দেবতাদের মধ্যে অবতরণ করেন। ভীষ্মদেবের মতো মহাজনেরা কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাঁর এই মোহময়ী প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পান।

শ্লোক ১৯

অস্যানুভাবং ভগবান্ বেদ গুহ্যতমং শিবঃ।
দেবর্ষির্নারদঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কপিলো নৃপ ॥ ১৯ ॥

অস্য—তাঁর; **অনুভাবম্**—মহিমারাজি; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **বেদ**—জানেন; **গুহ্য-তমম্**—অতি নিগূঢ়; **শিবঃ**—শিব; **দেব-ঋষিঃ**—দেবতাদের মধ্যে যিনি ঋষি; **নারদঃ**—নারদ; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **ভগবান্**—পরম পুরুষ ভগবান; **কপিলঃ**—কপিল; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, শিব, দেবর্ষি নারদ এবং ভগবদাবতার কপিলদেব আদি সকলেই সাক্ষাৎ সংস্পর্শের মাধ্যমে তাঁর অতি নিগূঢ় মহিমারাজি সম্বন্ধে অবগত।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা সকলেই হচ্ছেন *ভাব*, অর্থাৎ যাঁরা বিভিন্ন প্রকার দিব্য প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অবগত। ভগবানের যেমন অসংখ্য অংশ-বিস্তার রয়েছেন, তেমনই তাঁর অসংখ্য শুদ্ধভক্তও রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন রসে তাঁর সেবায় যুক্ত। ভগবানের বারোজন মহান্ ভক্ত রয়েছেন, এবং তাঁরা হলেন ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, ভীষ্ম, জনক, শুকদেব গোস্বামী, বলি মহারাজ এবং যমরাজ। ভীষ্মদেব যদিও তাঁদের মধ্যে অন্যতম, কিন্তু তিনি বারোজনের মধ্যে এখানে কেবল তিনটি মুখ্য নামের উল্লেখ করেছেন, যাঁরা ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অবগত। আধুনিক যুগের মহান আচার্যদের অন্যতম শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অনুভাবের* বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, ভগবানের মহিমা সর্বপ্রথম আনন্দ-বিভোর ভক্ত অনুভব করেন, যা স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক আদি লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ভগবানের মহিমা অবিচলিতভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে সেই অনুভাব ক্রমশ বর্ধিত হয়। ভাবের এই বিনিময় যশোদা এবং ভগবানের মধ্যে হয়েছিল রজ্জু দ্বারা ভগবানকে বন্ধন করার লীলায়, এবং ভগবানের সঙ্গে অর্জুনের সারথ্য লীলায়। ভগবানের এই মহিমা প্রদর্শিত হয় তাঁর ভক্তের অধীন হওয়ার মাধ্যমে, এবং সেটিও ভগবানের মহিমার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। শুকদেব গোস্বামী এবং কুমারগণ দিব্য পদে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও আর এক প্রকার ভাবের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। ভগবান যখন তাঁর ভক্তদের বিপদে ফেলেন, সে সময়েও ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে দিব্য ভাবের বিনিময় হয়। ভগবান বলেছেন, "আমি আমার ভক্তকে বিপদে ফেলি, যাতে সে আমার সঙ্গে দিব্য ভাবের প্রভাবে আরও শুদ্ধ হয়।" ভক্তকে জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশায় ফেলার ফলে ভগবানকে মোহময়ী জড়জাগতিক সম্বন্ধ থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে হয়। জড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রধানত জড় বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

জড় আনন্দকে কেন্দ্র করে। তাই ভগবান যখন জড় বিষয়গুলি প্রত্যাহার করে নেন, তখন ভক্ত সর্বতোভাবে তাঁর প্রেমময়ী সেবার প্রতি আকৃষ্ট হন। এইভাবে ভগবান পতিত জীবকে জড় অস্তিত্বের কলুষ থেকে জোরপূর্বক উদ্ধার করেন। ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত ভক্তের দুঃখ পাপময় কার্যকলাপজনিত দুঃখ-দুর্দশা থেকে ভিন্ন। ভগবানের এই সমস্ত মহিমা সম্বন্ধে ব্রহ্মা, শিব, নারদ, কপিল, কুমার এবং ভীষ্ম আদি উল্লিখিত মহাজনেরা অবগত ছিলেন, এবং তাঁদের করুণার প্রভাবেই তা আয়ত্ত করা যায়।

শ্লোক ২০

যং মন্যসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃত্তমম্ ।
অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহৃদাদথ সারথিম্ ॥ ২০ ॥

যম্—যিনি; **মন্যসে**—মনে কর; **মাতুলেয়ম্**—মাতুল-পুত্র; **প্রিয়ম্**—অতি প্রিয়; **মিত্রম্**—সখা; **সুহৃৎ-তমম্**—অতি শুভাকাঙ্ক্ষী; **অকরোঃ**—সম্পাদন করেছেন; **সচিবম্**—মন্ত্রণাদাতা; **দূতম্**—বার্তাবাহক; **সৌহৃদাৎ**—শুভেচ্ছার প্রভাবে; **অথ**—তার ফলে; **সারথিম্**—রথ চালক।

অনুবাদ

হে রাজন্, নিতান্তই মোহের বশে যাঁকে তোমরা তোমাদের মাতুল-পুত্র, অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী, মন্ত্রণাদাতা, দূত, হিতকারী, সারথি ইত্যাদি বলে মনে করেছ, তিনিই হচ্ছেন সেই পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও পাণ্ডবদের মাতুল-পুত্র, ভ্রাতা, সখা, শুভাকাঙ্ক্ষী, মন্ত্রণাদাতা, দূত, হিতকারীরূপে লীলাবিলাস করছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এবং তাঁর অনন্য ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তিনি বিভিন্ন প্রকার সেবা সম্পাদন করে থাকেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি পরম পুরুষ রূপে তাঁর পরম পদের পরিবর্তন করেছেন। তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে চিন্তা করা হচ্ছে অজ্ঞানতার স্থূলতম প্রকাশ।

শ্লোক ২১

সর্বাত্মনঃ সমদৃশো হ্যদ্বয়স্যানহঙ্কৃতেঃ ।
তৎকৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্য ন ক্বচিৎ ॥ ২১ ॥

সর্বাত্মনঃ—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান; **সম-দৃশঃ**—যিনি সকলের প্রতি সমভাবে কৃপালু; **হি**—অবশ্যই; **অদ্বয়স্য**—অদ্বয় তত্ত্বের; **অনহঙ্কৃতেঃ**—যিনি জড় অভিমানশূন্য; **তৎ-কৃতম্**—তিনি যা কিছু করেন; **মতি**—চেতনা; **বৈষম্যম্**—ভেদবুদ্ধি; **নিরবদ্যস্য**—সর্ব প্রকার আসক্তিরহিত; **ন**—না; **ক্বচিৎ**—কখনো।

অনুবাদ

অদ্বয়-তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি সকলের প্রতি সমভাবে করুণাশীল, ভেদবুদ্ধিজনিত অভিমানশূন্য এবং সকল প্রকার আসক্তিরহিত। তাই তিনি যা করেন, তা সবই জড় বিকারশূন্য। তিনি সমভাবাপন্ন পুরুষ।

তাৎপর্য

তিনি যেহেতু পরম তত্ত্ব, তাই কোন কিছুই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নয়। তিনি কৈবল্য; তিনি ব্যতীত কোনকিছুরই অস্তিত্ব নেই। সবকিছুই এবং সকলেই তাঁর শক্তির প্রকাশ, এবং এইভাবে তিনি এই সমস্ত কিছু থেকে অভিন্নভাবে তাঁর শক্তির মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান। সূর্যকে জানা যায় তার প্রতিটি রশ্মি এবং রশ্মির কণাসমূহের মাধ্যমে। সেইরকম ভগবানও তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকেন। তিনি পরমাত্মা, পরম অভিভাবকরূপে সকলের মধ্যেই বর্তমান; তাই তিনি প্রতিটি জীবেরই সারথি এবং মন্ত্রণাদাতা। তাই তিনি অর্জুনের সারথিরূপে নিজেকে প্রকাশ করলেও তাঁর পরম পদের কোন পরিবর্তন হয় না। কেবল ভক্তিযোগের ফলেই তিনি সারথি বা দূতরূপে প্রকাশিত হন। যেহেতু তিনি পরমাত্মা এবং তাঁর জড় জাগতিক জীবনে করার কিছুই নেই, তাই তাঁর ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কার্য বলেও কিছু নেই। পরম পুরুষ হওয়ার ফলে তিনি সর্বপ্রকার মিথ্যা অভিমান থেকে মুক্ত এবং নিজেকে কোনকিছু থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন না। এই ধরনের মিথ্যা অভিমান না থাকার জন্য তিনি সমভাবাপন্ন। তাই তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সারথি হওয়ার জন্য নিজেকে নিকৃষ্ট বা হেয় বলে মনে করেন না। করুণাময় ভগবানের কাছ থেকে যে এই ধরনের সেবালাভ করেন, সেটি শুদ্ধ ভক্তেরই মহিমা।

শ্লোক ২২

তথাপ্যেকান্তভক্তেষু পশ্য ভূপানুকম্পিতম্।
যন্মেঽসূংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ ॥ ২২ ॥

তথাপি—তবুও; **একান্ত**—ঐকান্তিক; **ভক্তেষু**—ভক্তদের প্রতি; **পশ্য**—দেখ; **ভূপ**—হে রাজন্; **অনুকম্পিতম্**—কত সহানুভূতিসম্পন্ন; **যৎ**—যার জন্য; **মে**—আমার; **অসূন্**—জীবন; **ত্যজতঃ**—ত্যাগের সময়ে; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **দর্শনম্**—আমার গোচরীভূত; **আগতঃ**—দয়া করে এসেছেন।

অনুবাদ

সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার জীবনের অন্তিম সময়ে কৃপা করে আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন, কারণ আমি তাঁর ঐকান্তিক সেবক।

তাৎপর্য

পরম তত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর যে ঐকান্তিক ভক্ত সম্পূর্ণভাবে তাঁর শরণাগত হয়েছেন এবং যিনি অন্য কাউকে তাঁর রক্ষাকর্তা এবং প্রভু বলে জানেন না, তাঁর প্রতি অধিক অনুরক্ত। পরমেশ্বর ভগবানকে পালক, সখা এবং প্রভুরূপে স্বীকার করে তাঁর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া শাশ্বত জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। সর্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছাক্রমে জীবকে এমনইভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে সে যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁর আশ্রিত হয় তখনই সে সবচাইতে সুখী হয়।

তার বিপরীত অবস্থাই জীবের অধঃপতনের কারণ। জীবের অধঃপতনের এই প্রবণতা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বলে মনে করে জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করার ফলে দেখা দেয়। তাঁর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে তার মিথ্যা অহঙ্কার। মানুষের কর্তব্য সমস্ত অবস্থাতেই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

ভীষ্মদেব ভগবানের একজন অনন্য ভক্ত ছিলেন বলেই তাঁর মৃত্যুশয্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের দেহগত সম্পর্ক ছিল, কেননা ভগবান ছিলেন তাঁর মাতুল-পুত্র। কিন্তু ভীষ্মের তাঁর সঙ্গে সেরকম কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই এই আকর্ষণের কারণ ছিল আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তথাপি দেহের সম্পর্ক যেহেতু অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং স্বাভাবিক, তাই ভগবানকে যখন নন্দনন্দন, যশোদানন্দন, রাধাবল্লভ ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয় তখন তিনি অধিক প্রসন্ন হন। ভগবানের সঙ্গে এই প্রকার দৈহিক সম্পর্ক ভগবানের সঙ্গে প্রেম-বিনিময়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ভীষ্মদেব এই দিব্য রসের মাধুর্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি ভগবানকে নন্দনন্দন বা যশোদানন্দনেরই মতো বিজয়সখে, পার্থসখে ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছেন। অপ্রাকৃত মাধুর্যে তাঁর সঙ্গে

সম্পর্ক স্থাপন করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে তাঁর সুবিদিত ভক্তদের মাধ্যমে তাঁর সমীপবর্তী হওয়া। কখনো সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত নয়; আমাদের অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে এমন কোন সুযোগ্য এবং স্বচ্ছ মাধ্যমের সহায়তায় তাঁর সমীপবর্তী হওয়া উচিত।

শ্লোক ২৩

ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্মভিঃ ॥ ২৩ ॥

ভক্ত্যা—ভক্তিযোগের দ্বারা; **আবেশ্য**—আবিষ্ট; **মনঃ**—মন; **যস্মিন্**—যাঁর; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **যৎ**—শ্রীকৃষ্ণ; **নাম**—দিব্য নাম; **কীর্তয়ন্**—উচ্চারণ করতে করতে; **ত্যজন্**—ত্যাগ করেন; **কলেবরম্**—এই জড়দেহ; **যোগী**—ভক্ত; **মুচ্যতে**—মুক্ত হন; **কাম-কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

ভক্তিসমাহিত চিত্তে যে ভক্তেরা তাঁর ভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, তিনি তাঁদের জড়দেহ ত্যাগের সময় সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

তাৎপর্য

যোগের অর্থ হচ্ছে অন্য সমস্ত বিষয় থেকে মনকে মুক্ত করে একাগ্র করা। প্রকৃতপক্ষে এই একাগ্রতাই হচ্ছে সমাধি, বা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। যিনি এইভাবে তাঁর চিত্তকে একাগ্র করেন, তিনিই হচ্ছেন যোগী। ভগবানের এই প্রকার যোগীভক্ত ভগবানের সেবায় দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই যুক্ত থাকেন, যাতে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং তাঁর সবকিছু ভগবানকে নিবেদন করার মাধ্যমে আত্মসমর্পণ আদি নবধা ভক্তি যাজনের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত চেতনা সর্বদা ভগবানে আবিষ্ট থাকে। এইভাবে যোগ অনুশীলনের ফলে অথবা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ভগবানের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করা যায়, যে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* সমাধির সর্বোচ্চ সিদ্ধির বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রকার দুর্লভ ভক্তকে ভগবান সমস্ত যোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন। ভগবৎ-কৃপা প্রাপ্ত এই প্রকার সিদ্ধযোগী পূর্ণ চেতনায় তাঁর মনকে ভগবানে একাগ্রীভূত করে, এবং এইভাবে তাঁর দেহ ত্যাগ করার সময় ভগবানের

শ্লোক ১৩

সর্বে হ্যমী বিধিকরাস্তব সত্ত্বধাম্নো
ব্রহ্মাদয়ো বয়মিবেশ ন চোদ্বিজন্তঃ ।
ক্ষেমায় ভূতয় উতাত্মসুখায় চাস্য
বিক্রীড়িতং ভগবতো রুচিরাবতারৈঃ ॥ ১৩ ॥

সর্বে—সমস্ত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অমী**—এই সমস্ত; **বিধি-করাঃ**—আদেশ পালনকারী; **তব**—আপনার; **সত্ত্ব-ধাম্নঃ**—সর্বদা চিৎ-জগতে স্থিত হয়ে; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ; **বয়ম্**—আমরা; **ইব**—সদৃশ; **ঈশ**—হে ভগবান; **ন**—না; **চ**—এবং; **উদ্বিজন্তঃ**—(আপনার ভয়ঙ্কর রূপের) ভয়ে ভীত; **ক্ষেমায়**—রক্ষার জন্য; **ভূতয়ে**—বৃদ্ধির জন্য; **উত**—বলা হয়; **আত্ম-সুখায়**—এই প্রকার লীলার দ্বারা নিজের প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **চ**—ও; **অস্য**—এই (জড় জগতের); **বিক্রীড়িতম্**—প্রকাশিত; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **রুচির**—অত্যন্ত মনোহর; **অবতারৈঃ**—আপনার অবতারদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান, ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত আপনার নিষ্ঠাপরায়ণ সেবক। তাই তাঁরা আমাদের মতো নন (প্রহ্লাদ এবং তাঁর আসুরিক পিতা হিরণ্যকশিপু)। এই ভয়ঙ্কর রূপে আপনার আবির্ভাব আপনার নিজের আনন্দ বিধানের জন্য আপনারই লীলাবিলাস। আপনার এই প্রকার অবতার জগতের মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ বলতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর পিতা এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত দুর্ভাগা, কারণ তাঁরা ছিলেন আসুরিক ভাবাপন্ন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই সৌভাগ্যবান, কারণ তাঁরা সর্বদাই ভগবানের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত থাকেন। ভগবান যখন তাঁর বিভিন্ন অবতারে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি দুটি কার্য সম্পাদন করেন—ভক্তদের রক্ষা এবং অসুরদের বিনাশ (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। নৃসিংহদেবের মতো ভগবানের অবতার অবশ্যই ভক্তদের ভীতি উৎপাদনের জন্য নয়, কিন্তু তা

সত্ত্বেও ভক্তেরা অত্যন্ত সরল এবং অনুগত হওয়ার ফলে, ভগবানের এই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে ভীত হয়েছিলেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ পরবর্তী প্রার্থনায় ভগবানকে অনুরোধ করেছেন তাঁর ক্রোধ পরিত্যাগ করার জন্য।

শ্লোক ১৪

তদ্ যচ্ছ মন্যুমসুরশ্চ হতস্ত্বয়াদ্য
মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিকসর্পহত্যা ।
লোকাশ্চ নির্বৃতিমিতাঃ প্রতিয়ন্তি সর্বে
রূপং নৃসিংহ বিভয়ায় জনাঃ স্মরন্তি ॥ ১৪ ॥

তৎ—অতএব; **যচ্ছ**—দয়া করে পরিত্যাগ করুন; **মন্যুম্**—আপনার ক্রোধ; **অসুরঃ**—আমার পিতা মহা অসুর হিরণ্যকশিপু; **চ**—ও; **হতঃ**—নিহত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অদ্য**—আজ; **মোদেত**—আনন্দিত হন; **সাধুঃ অপি**—সাধু ব্যক্তিও; **বৃশ্চিক-সর্প-হত্যা**—সর্প অথবা বৃশ্চিককে হত্যা করে; **লোকাঃ**—সমস্ত লোক; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **নির্বৃতিম্**—আনন্দ; **ইতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **প্রতিয়ন্তি**—অপেক্ষা করছে (আপনার ক্রোধ উপশমের জন্য); **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **রূপম্**—রূপ; **নৃসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব; **বিভয়ায়**—তাদের ভয় নিবারণের জন্য; **জনাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকেরা; **স্মরন্তি**—স্মরণ করবে।

অনুবাদ

হে ভগবান নৃসিংহদেব, তাই, আপনি এখন আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন, কারণ আমার পিতা মহা অসুর হিরণ্যকশিপু এখন নিহত হয়েছে। সাধু ব্যক্তিও যেমন সর্প অথবা বৃশ্চিক হত্যা করে আনন্দিত হন, সমগ্র জগৎ এই অসুরের মৃত্যুতে পরম সন্তোষ লাভ করেছে। এখন তারা তাদের সুখ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে, এবং ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা সর্বদা আপনার এই মঙ্গলময় অবতারকে স্মরণ করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, সাধু ব্যক্তিরা যদিও কোন জীবকে হত্যা করতে চান না, তবুও তাঁরা সর্প, বৃশ্চিক আদি ঈর্ষাপরায়ণ জীব নিহত হলে প্রসন্ন হন। হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করা হয়েছিল কারণ সে ছিল সর্প অথবা বৃশ্চিকের

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, ভীষ্মদেবের সেই মর্মস্পর্শী বাক্য শ্রবণ করে, মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত মহান ঋষিবর্গের সমক্ষে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের কাছে ধর্ম-বিষয়ক বিভিন্ন কর্তব্যকর্মাদির অত্যাবশ্যক নীতি-নিয়মাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

ভীষ্মদেবকে এইভাবে মর্মস্পর্শী স্বরে কথা বলতে দেখে মহারাজ যুধিষ্ঠির বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি শীঘ্রই দেহত্যাগ করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি যেন ধর্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু মহর্ষিদের উপস্থিতিতে যুধিষ্ঠির মহারাজকে ভীষ্মদেবের কাছে প্রশ্ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে বুঝিয়েছিলেন যে ভীষ্মদেবের মতো মহান ভগবদ্ভক্ত আপাতদৃষ্টিতে একজন বৈষয়িক মানুষের মতো জীবন-যাপন করলেও মহর্ষিদের থেকে, এমনকি ব্যাসদেবের থেকেও শ্রেষ্ঠ। আর একটি বিষয় হচ্ছে যে ভীষ্মদেব তখন কেবল শরশয্যাতেই শায়িত ছিলেন না, অধিকন্তু সেই অবস্থায় তিনি অত্যন্ত বেদনাও অনুভব করছিলেন এরকম অবস্থায় তাঁকে কোন প্রশ্ন করা উচিত ছিল না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে দেহ এবং মনে পূর্ণরূপে সুস্থ থাকেন; অতএব ভগবদ্ভক্ত যে কোন অবস্থাতেই জীবনের আদর্শ মার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। যুধিষ্ঠির মহারাজও চেয়েছিলেন যে সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা, যাঁদের ভীষ্মদেবের থেকে অধিক বিজ্ঞ বলে মনে হয়েছিল, তাঁদের প্রশ্ন না করে ভীষ্মদেবের দ্বারাই তাঁর জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান করেন। সে সবই হয়েছিল মহান চক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থাপনায়, যিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তের মহিমা স্থাপন করেন। পিতা চান যে তাঁর পুত্র যেন তাঁর থেকেও অধিক খ্যাতি লাভ করে। ভগবান বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করেছেন যে তাঁর ভক্তের পূজা তাঁর পূজার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৬

পুরুষস্বভাববিহিতান্ যথাবর্ণং যথাশ্রমম্ ।
বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যামাম্নাতোভয়লক্ষণান্ ॥ ২৬ ॥

পুরুষ—মানুষ; **স্ব-ভাব**—গুণ অনুসারে জাত প্রকৃতি; **বিহিতান্**—নির্দিষ্ট; **যথা**—অনুসারে; **বর্ণম্**—বর্ণ-বিভাগ; **যথা**—অনুসারে; **আশ্রমম্**—আশ্রম-বিভাগ; **বৈরাগ্য**—ত্যাগ; **রাগ**—আসক্তি; **উপাধিভ্যাম্**—উপাধিসমূহ থেকে; **আম্নাত**—বিধিবদ্ধভাবে; **উভয়**—উভয়; **লক্ষণান্**—লক্ষণাদি থেকে।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধিৎসায় ভীষ্মদেব প্রথম মানুষের জীবনের স্বভাব ও যোগ্যতা অনুসারে সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগের সংজ্ঞা বিবৃত করলেন। তারপর তিনি যথাক্রমে দুই শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমে অনাসক্তির প্রতিরোধী ক্রিয়া এবং আসক্তির অন্তঃক্রিয়ার বর্ণনা করলেন।

তাৎপর্য

স্বয়ং ভগবান কর্তৃক *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) প্রদত্ত চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ধারণা মানুষের দিব্য গুণাবলী বৃদ্ধি করার জন্য, যাতে তারা তাদের চিন্ময় স্বরূপ অবগত হতে পারে এবং তারফলে ভব-বন্ধন বা বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হতে পারে। প্রায় সব কটি পুরাণেই এই বিষয়টি একইভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং মহাভারতের শান্তি-পর্বেও ষষ্ঠিতম অধ্যায় থেকে ভীষ্মদেব কর্তৃক তা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সভ্য মানুষদের জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সার্থকভাবে মানব জীবনে পূর্ণতা লাভের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আত্ম-উপলব্ধি আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনে রত নিম্নস্তরের পশুজীবন থেকে ভিন্ন। ভীষ্মদেব সমস্ত মানুষের জন্য নটি গুণের উপদেশ দিয়েছেন—(১) ক্রোধ না করা, (২) মিথ্যা কথা না বলা, (৩) সম্পদ সমানভাবে বিতরণ করা, (৪) ক্ষমা করা, (৫) বিবাহিত পত্নীর মাধ্যমেই কেবল সন্তান উৎপাদন করা, (৬) মন এবং শরীরে শুদ্ধ থাকা, (৭) কারও প্রতি শত্রুভাব পোষণ না করা, (৮) সরল হওয়া, এবং (৯) ভৃত্য ও আশ্রিতদের পালন করা। যদি কারও উপরোক্ত প্রাথমিক গুণগুলি না থাকে, তাহলে তাকে সভ্য বলা যায় না। আর তা ছাড়া, ব্রাহ্মণ (বুদ্ধিমান মানুষ), ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত তাদের বৃত্তি অনুসারে বিশেষ গুণাবলী অর্জন করা। বুদ্ধিমান শ্রেণী বা ব্রাহ্মণদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম করা। এটি নৈতিক জীবনের ভিত্তি। বিবাহিত পত্নীর সঙ্গেও যৌন-সংযোগ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক, এবং তারফলে আপনা থেকেই পরিবার নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বুদ্ধিমান মানুষ যদি বৈদিক জীবন-যাত্রার ধারা অনুসরণ না করে, তাহলে তার মহান যোগ্যতার অপব্যবহার হয়। অর্থাৎ তার কর্তব্য

হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* । বৈদিক জ্ঞান লাভ করার জন্য এমন কোন ব্যক্তির শরণাগত হওয়া উচিত যিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত। শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলি তার কোনমতেই আচরণ করা উচিত নয়। কোন ব্যক্তি যদি মদ্যপান করে অথবা ধূমপান করে, তাহলে সে শিক্ষক হতে পারে না। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের পুঁথিগত বিদ্যারই বিচার করা হয়, তার নৈতিক জীবনের কথা বিবেচনা করা হয় না। তাই শিক্ষার ফলস্বরূপ উন্নত বুদ্ধিমত্তার নানারকম অপব্যবহার হচ্ছে।

ক্ষত্রিয় বা শাসক শ্রেণীর সদস্যদের দান করার জন্য এবং কোন পরিস্থিতিতেই দান গ্রহণ না করার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক প্রশাসকেরা রাজনৈতিক কার্যের জন্য দান গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু কোন রাষ্ট্রীয় উৎসবে নাগরিকদের কোনকিছু দান করে না। এটি বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশের ঠিক বিপরীত অবস্থা। শাসকবর্গকে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়, কিন্তু তাদের কখনো শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। শাসকদের কখনো অহিংস হওয়ার অভিনয় করা উচিত নয়, যার ফলে তারা নরকগামী হয়। অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অহিংস কাপুরুষ হতে চেয়েছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন। এইভাবে অহিংসার বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য ভগবান অর্জুনকে অনার্য বা অসভ্য বলে অভিহিত করেছিলেন। শাসকবর্গকে অবশ্যই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হয়। কাপুরুষদের কখনো কেবল জনসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত করা উচিত নয়। প্রাচীনকালে রাজারা সকলেই ছিলেন বীরপুরুষ, এবং তাই ক্ষত্রিয় রাজার বৃত্তিগত কর্তব্য সম্বন্ধে যদি যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে রাজতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রশাসন করা যেতে পারে। যুদ্ধে রাজা অথবা রাষ্ট্রপতির শত্রুর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করা উচিত নয়। এখনকার তথাকথিত সমস্ত রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত যায় না। মিথ্যা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার আশায় তারা সামরিক শক্তিকে কৃত্রিমভাবে অনুপ্রাণিত করতে অত্যন্ত দক্ষ। শাসকশ্রেণী যখনই বৈশ্য এবং শূদ্রে পরিণত হয়, তখন সমগ্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দূষিত হয়ে যায়।

বৈশ্য বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে গাভীদের রক্ষা করার জন্য। গো-রক্ষা মানে হচ্ছে দুগ্ধজাত পদার্থ, অর্থাৎ দধি এবং মাখন উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বৈদিক জ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তার ভিত্তিতে কৃষিকার্য এবং খাদ্যদ্রব্যের বিতরণ, এবং সেই সঙ্গে দান করা হচ্ছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের

প্রধান কর্তব্য। ক্ষত্রিয়দের যেমন নাগরিকদের রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনই বৈশ্যদের পশুদের রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশুদের কখনও হত্যা করা উচিত নয়। এই প্রকার পশুহত্যা বর্বর সমাজের লক্ষণ। মানুষদের জন্য কৃষিজাত দ্রব্য, ফল এবং দুধ হচ্ছে আদর্শ খাদ্য এবং তা পর্যাপ্তরূপে পাওয়া যায়। মানব সমাজের কর্তব্য গৃহপালিত পশুদের রক্ষার ব্যাপারে অধিক মনোযোগ দেওয়া। শ্রমিক সম্প্রদায়ের উৎপাদন শক্তি যখন কলকারখানায় ব্যবহার করা হয় তখন তার অপব্যবহার হয়। বিভিন্ন প্রকার কলকারখানাগুলি কখনও মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি, যথা চাল, গম, শস্য, দুধ, ফল এবং শাকসবজি উৎপাদন করতে পারে না। যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের ফলে এক শ্রেণীর স্বার্থপর ব্যক্তিদের কৃত্রিম জীবনযাত্রার মান বর্ধিত হয়, আর হাজার হাজার মানুষ অনাহারে থাকে এবং অশান্তি ভোগ করে। এটি কখনও মানব সভ্যতার আদর্শ হওয়া উচিত নয়।

শূদ্র বা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের স্বতন্ত্রতা থাকা উচিত নয়। তাদের কর্তব্য হচ্ছে ঐকান্তিকভাবে সমাজের তিনটি উচ্চ বর্ণের সেবা করা। উচ্চ বর্ণের সেবা করার মাধ্যমে শূদ্রেরা জীবনের সবরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারে। শাস্ত্রে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শূদ্রের কখনও ধন সঞ্চয় করা উচিত নয়। শূদ্র যখনই ধন সঞ্চয় করে, তখনই সে আসব পান, স্ত্রীসঙ্গ এবং দ্যূতক্রীড়া আদি পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে সেই ধনের অপব্যবহার করবে। আসব পান, স্ত্রীসঙ্গ এবং দ্যূতক্রীড়া সূচিত করে যে জনসাধারণ শূদ্রের থেকেও অধঃপতিত হয়ে গেছে। উচ্চ বর্ণের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা শূদ্রদের পালন করা, এবং তাদের পুরাতন এবং ব্যবহৃত বস্ত্র সরবরাহ করা। প্রভু বৃদ্ধ এবং অক্ষম হলে শূদ্রের তাকে ত্যাগ করে যাওয়া উচিত নয়, এবং প্রভুর কর্তব্য হচ্ছে ভৃত্যকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট রাখা। কোন যজ্ঞের পূর্বে সর্বপ্রথমে শূদ্রদের প্রচুর ভোজন এবং বস্ত্রের দ্বারা সন্তুষ্ট করা উচিত। এই যুগে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বহু উৎসবের আয়োজন করা হয় কিন্তু দরিদ্র শ্রমিকদের ভোজন করানো হয় না, দান দেওয়া হয় না বা বস্ত্র ইত্যাদি দেওয়া হয় না। তারফলে শ্রমিকেরা অসন্তুষ্ট হয় এবং আন্দোলন করে।

এক কথায় বর্ণ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির বিভাগ, এবং আশ্রম ধর্ম হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধির পথে প্রগতির ক্রম। তারা উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আশ্রম ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য জাগ্রত করা। ব্রহ্মচারী আশ্রম ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ স্থল। এই আশ্রমে শিক্ষা দেওয়া হয় যে এই জড় জগৎ জীবের প্রকৃত আবাস নয়। বদ্ধ জীবেরা জড়া

প্রকৃতির বন্ধনে বন্দী হয়ে আছে, এবং তাই আত্ম-উপলব্ধি হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য। সমগ্র আশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈরাগ্য সাধন। যিনি বৈরাগ্যের এই মূল ভাবনা গ্রহণে অক্ষম, তাকে বৈরাগ্যের ভাব নিয়ে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তাই যে বৈরাগ্যের ভাব প্রাপ্ত হয়েছে, সে তৎক্ষণাৎ চতুর্থ আশ্রম বা সন্ন্যাস আশ্রম সরাসরিভাবে গ্রহণ করতে পারে, এবং ধন সঞ্চয় না করে তাকে কেবল দান গ্রহণের মাধ্যমে চরম উপলব্ধির জন্য দেহ ধারণ করতে হয়। গৃহস্থ আশ্রম আসক্তদের জন্য এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম তাদেরই জন্য, যারা জড় জাগতিক জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়েছে। ব্রহ্মচর্য আশ্রম আসক্ত এবং বিরক্ত উভয়েরই প্রশিক্ষণের জন্য।

শ্লোক ২৭

দানধর্মান্ রাজধর্মান্ মোক্ষধর্মান্ বিভাগশঃ।
স্ত্রীধর্মান্ ভগবদ্ধর্মান্ সমাসব্যাসযোগতঃ ॥ ২৭ ॥

দান-ধর্মান্—দান করার পন্থা; **রাজ-ধর্মান্**—রাজার কর্তব্য; **মোক্ষ-ধর্মান্**—মুক্তিলাভের উপায়; **বিভাগশঃ**—বিভাগ অনুসারে; **স্ত্রী-ধর্মান্**—স্ত্রীলোকেদের কর্তব্য; **ভগবৎ-ধর্মান্**—ভগবদ্ভক্তির পন্থা; **সমাস**—সাধারণভাবে; **ব্যাস**—বিশদভাবে; **যোগতঃ**—উপায়।

অনুবাদ

তারপর তিনি বিভাগ অনুসারে দানধর্ম, রাজধর্ম, এবং মোক্ষধর্মসমূহ ব্যাখ্যা করলেন। তারপর তিনি স্ত্রীলোক এবং ভক্তদের কর্তব্যকর্মাদি সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত দুভাবেই বর্ণনা করলেন।

তাৎপর্য

দান করা গৃহস্থদের প্রধান কর্তব্য, এবং তার কষ্টার্জিত ধনের অন্তত শতকরা পঞ্চাশভাগ দান করার জন্য তার প্রস্তুত থাকা উচিত। ব্রহ্মচারী বা শিক্ষার্থীর কর্তব্য হচ্ছে আত্মত্যাগ, গৃহস্থের কর্তব্য দান করা, এবং বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যা অনুশীলন করা। আশ্রম জীবনে বা আত্ম-উপলব্ধির পথে জীবনের বিভাগসমূহে এগুলি হচ্ছে সাধারণ কর্তব্য। ব্রহ্মচর্য জীবনে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয় যার ফলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে জগতের সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের

সম্পদ। তাই কেউই এই পৃথিবীর কোন কিছুই নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করতে পারে না। তাই গৃহস্থ আশ্রমের মানুষদের, যাদের মৈথুন-সুখ উপভোগের এক প্রকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের ভগবানের সেবায় দান করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবানের শক্তি থেকেই সকলে শক্তিপ্রাপ্ত হয়; তাই সেই শক্তির ফলস্বরূপ সমস্ত ক্রিয়া ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবারূপে ভগবানকে অর্পণ করা উচিত। নদী যেমন মেঘের মাধ্যমে সমুদ্র থেকে জল সংগ্রহ করে পুনরায় সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির উৎস থেকে লব্ধ আমাদের শক্তি ভগবানকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। সেটিই হচ্ছে আমাদের শক্তির সার্থকতা। তাই ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) বলেছেন যে আমরা যা কিছু কার্য করি, যে কোন তপস্যা করি, যে কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি, যা কিছু খাই এবং যা কিছু দান করি, তা সবই তাঁকে (ভগবানকে) নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। সেটিই আমাদের ধার করা শক্তির যথার্থ সদ্ব্যবহারের পন্থা। যখন আমাদের শক্তি এইভাবে আমরা ব্যবহার করি, তখন আমাদের শক্তি জড় জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হয়, এইভাবে আমরা ভগবানের সেবা করার স্বাভাবিক জীবন লাভ করার যোগ্য হই। রাজধর্ম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের জন্য আধুনিক কূটনীতি থেকে ভিন্ন এক মহান বিজ্ঞান। এই পন্থার মাধ্যমে রাজাদের শিক্ষা দেওয়া হত একজন সাধারণ কর সংগ্রাহক না হয়ে একজন দানবীর হওয়ার। তাদের শিক্ষা দেওয়া হত প্রজাদের সমৃদ্ধির জন্যই কেবল বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার। প্রজাদের মুক্তিলাভের পথে পরিচালিত করা ছিল রাজার সবচাইতে বড় কর্তব্য। পিতা, গুরু এবং রাজাকে কখনই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করার বিষয়ে উদাসীন বা দায়িত্বহীন হওয়া উচিত নয়। যখন এই প্রাথমিক কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, তখন আর জনসাধারণের দ্বারা রচিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজন হয় না। আধুনিক যুগে ভোট আদায় করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ প্রশাসনিক পদ অধিকার করে। কিন্তু রাজাদের প্রাথমিক কর্তব্য সম্বন্ধে তারা কখনও কোনরকম শিক্ষালাভ করে না, এবং সকলের পক্ষে সেই শিক্ষালাভ করা সম্ভবও নয়। এই পরিস্থিতিতে অনভিজ্ঞ প্রশাসকেরা প্রজাদের সর্বতোভাবে সুখী করার পরিবর্তে এক ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত অনভিজ্ঞ প্রশাসকেরা ধীরে ধীরে চোর এবং প্রবঞ্চকে পরিণত হয় এবং সর্বতোভাবে অকেজো এক ভারাক্রান্ত সরকার পরিচালনার জন্য ক্রমাগত কর বৃদ্ধি করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যোগ্য ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে *মনু-সংহিতা* এবং পরাশর মুনির *ধর্মশাস্ত্র* আদি শাস্ত্রের ভিত্তিতে রাজাদের যথাযথভাবে রাজ্যশাসন করার জন্য উপদেশ দেওয়া।

একজন যথার্থ রাজা সাধারণ জনগণের আদর্শ; এবং রাজা যদি পুণ্যবান, ধর্মপরায়ণ, বীর্যবান, এবং উদার হন, তাহলে নাগরিকেরা তাঁকে অনুসরণ করে। এই প্রকার রাজা কখনই প্রজাদের অর্থে প্রতিপালিত একজন অলস কামুক ব্যক্তি নয়, পক্ষান্তরে তিনি সর্বদা চোর এবং দস্যুদের হত্যা করতে প্রস্তুত থাকেন। পুণ্যাত্মা রাজারা কখনই অর্থহীন অহিংসার নামে দস্যু এবং চোরদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হন না। তাঁরা তাদের এমনভাবে দণ্ড দান করতেন যাতে ভবিষ্যতে কেউ সেরকম অপকর্ম করতে সাহস না করে। আজকাল যেমন চোর এবং ডাকাতেরা রাজ্য পরিচালনা করে, তখন তা মোটেই হত না।

কর সংগ্রহের পন্থা ছিল অত্যন্ত সরল। কাউকে কখনও জোর করা হত না এবং পরের সম্পত্তিতে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা হত না। প্রজাদের উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করার অধিকার রাজার ছিল। রাজা প্রজাদের সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ দাবি করতে পারতেন। প্রজারাও তা দিতে নারাজ হত না, কেননা পুণ্যাত্মা রাজা এবং ধর্মীয় ঐক্যের ফলে শস্য, ফল, ফুল, রেশম, সূতা, দুধ, মণিরত্ন, ধাতু ইত্যাদি প্রাকৃত সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন হত; তাই জড় জাগতিক দিক দিয়ে কেউই অসুখী ছিল না। প্রজারা কৃষি এবং পশুধনে সমৃদ্ধ ছিল। তাই তাদের যথেষ্ট শস্য, ফল এবং দুধ ছিল, এবং তাদের সাবান, প্রসাধন, সিনেমা এবং মদিরালয়ের কোন রকম কৃত্রিম প্রয়োজন ছিল না।

রাজাকে দেখতে হত যে মানুষের সঞ্চিত শক্তি যাতে যথাযথভাবে ব্যবহার হয়। মানব শক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি; পশুপ্রবৃত্তিগুলির চরিতার্থতা নয়। সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা এই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ছিল। সেইজন্য রাজা যথাযথভাবে মন্ত্রীদের মনোনয়ন করতেন, ভোটের ভিত্তিতে নয়। মন্ত্রীদের, সেনাপতিদের এমনকি সাধারণ সৈন্যদেরও মনোনয়ন করা হত ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে, এবং তাদের পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে রাজা তাদের পর্যবেক্ষণ করতেন। রাজা বিশেষভাবে সতর্ক থাকতেন যাতে তপস্বীদের, বা পারমার্থিক জ্ঞান অর্জনের জন্য যারা সবকিছু ত্যাগ করেছেন, তাঁদের যেন কখনো কোনরকম অশ্রদ্ধা না করা হয়। রাজা ভালভাবে জানতেন যে পরমেশ্বর ভগবান কখনও তাঁর অনন্য ভক্তের অপমান সহ্য করতে পারেন না। এই প্রকার তপস্বীরা দুর্বৃত্ত এবং চোরদের কাছেও বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, যারা কখনো তাঁদের আদেশ অমান্য করত না। রাজা অশিক্ষিত, অসহায় এবং বিধবাদের বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করতেন। শত্রুর আক্রমণের পূর্বে প্রতিরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত। কর গ্রহণের প্রথা ছিল অত্যন্ত সরল, এবং তার অপব্যয় করা হত না, পক্ষান্তরে তার দ্বারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি

সুদৃঢ় করা হত। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হত, এবং বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাদের শিক্ষা দেওয়া হত।

মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য জয় করতে হত। ক্রোধ জয় করার জন্য ক্ষমা করতে শিখতে হয়। অবৈধ বাসনার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হয়। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা নিদ্রা জয় করা যায়। সহিষ্ণুতার দ্বারা লোভ জয় করা যায়। বিভিন্ন রোগের উৎপাত প্রতিহত করা যায় নিয়ন্ত্রিত আহারের দ্বারা। আত্ম-সংযমের দ্বারা মিথ্যা আশা থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করার ফলে অর্থের অপব্যয় বন্ধ করা যায়। যোগ অনুশীলনের ফলে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের ফলে বিষয়-তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়। বিহ্বলতা জয় করা যায় খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করার দ্বারা এবং তথ্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে মিথ্যা তর্ক জয় করা যায়। মৌনতা এবং গাম্ভীর্যের দ্বারা বাচালতা বর্জন করা যায় এবং বীর্যের দ্বারা ভয় জয় করা যায়। আত্ম-অনুশীলনের দ্বারা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভের জন্য কাম, লোভ, ক্রোধ, স্বপ্ন ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

স্ত্রীদের পুরুষের অনুপ্রেরণার উৎস বলে মনে করা হত। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের থেকে অধিক শক্তিশালী। শক্তিশালী জুলিয়াস সিজার ক্লীওপেট্রার বশীভূত ছিল। এই প্রকার শক্তিশালী স্ত্রীলোকেরা লজ্জার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই লজ্জা স্ত্রীলোকেদের ভূষণ। একবার এই নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গেলে স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারের দ্বারা সমাজে মহা উৎপাতের সৃষ্টি করে। ব্যভিচারের অর্থ হচ্ছে বর্ণসঙ্কর নামক অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপাদন, যা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

ভীষ্মদেবের উপদেশের শেষ বিষয়টি ছিল ভগবানকে প্রসন্ন করার পন্থা। প্রতিটি জীবই ভগবানের নিত্য দাস, এবং জীব যখন সে কথা ভুলে যায় তখন সে ভবসাগরে পতিত হয়। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের সরল পন্থা (বিশেষ করে গৃহস্থদের পক্ষে) গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করা। শ্রীবিগ্রহে মনকে একাগ্রীভূত করে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করা যায়। গৃহে অর্চা-বিগ্রহের পূজা, ভক্তের সেবা, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, পবিত্র স্থানে বাস এবং ভগবানের নাম কীর্তন—এই সমস্ত কার্যগুলি সম্পাদন করতে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয় না, অথচ তার দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায়। এইভাবে এই বিষয়ে পিতামহ তাঁর পৌত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ধর্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সহোপায়ান্ যথা মুনে।
নানাখ্যানেতিহাসেষু বর্ণয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥ ২৮ ॥

ধর্ম—বৃত্তিগত কর্তব্য-কর্ম; **অর্থ**—অর্থনৈতিক উন্নতি; **কাম**—বাসনার চরিতার্থতা; **মোক্ষান্**—চরম মুক্তি; **চ**—এবং; **সহ**—সহ; **উপায়ান্**—উপায়াদি; **যথা**—যেমন; **মুনে**—হে ঋষি; **নানা**—বিভিন্ন; **আখ্যান**—ঐতিহাসিক বর্ণনাদি; **ইতিহাসেষু**—ইতিহাসে; **বর্ণয়াম্ আস**—বর্ণনা করেছিলেন; **তত্ত্ব-বিৎ**—তত্ত্বজ্ঞ।

অনুবাদ

হে ঋষি, তারপর ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষলাভের উপায়াদি যথাপূর্বক বর্ণনা প্রসঙ্গে তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মদেব ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বিভিন্ন বর্ণ এবং আশ্রমের কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে বিবৃত করেছিলেন।

তাৎপর্য

পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ আদি বৈদিক শাস্ত্রে যে সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সমস্তই ঐতিহাসিক তথ্য, যা পুরাকালে ঘটেছিল। এই সমস্ত তথ্যগুলি অনেক সময় কালের ক্রম অনুসারে বর্ণিত নাও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তথাপি সেগুলি বাস্তব তথ্য ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ মানুষের জন্য উপদেশমূলক হওয়ার ফলে, এই সমস্ত তথ্যগুলি কালের পরিপ্রেক্ষিতে ধারাবাহিকরূপে না করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর তা ছাড়া সেগুলি ঘটেছিল বিভিন্ন লোকে, এমনকি বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে, এবং তাই সেই সমস্ত বর্ণনাগুলি কখনও কখনও তিনটি মাত্রায় মাপা হয়েছে। সেই সমস্ত ঘটনার উপদেশমূলক শিক্ষাই আমাদের গ্রহণীয় বিষয়, যদিও তা আমাদের সীমিত উপলব্ধিতে ধারাবাহিকভাবে মনে নাও হতে পারে। যুধিষ্ঠির মহারাজের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব সেই প্রকার ঘটনাই বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২৯

ধর্মং প্রবদতস্তস্য স কালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
যো যোগিনশ্ছন্দমৃত্যোর্বাঞ্ছিতস্তূত্তরায়ণঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্মম্—বৃত্তি অনুসারে কর্তব্য-কর্মাদি; **প্রবদতঃ**—বর্ণনা করার সময়ে; **তস্য**—তাঁর; **সঃ**—সেই; **কালঃ**—সময়; **প্রত্যুপস্থিতঃ**—যথাযথভাবে এসে উপস্থিত হল; **যঃ**—যা;

যোগিনঃ—যোগীদের; **ছন্দ-মৃত্যোঃ**—নিজের ইচ্ছায় যাঁর মৃত্যু হয় তাঁর; **বাঞ্ছিতঃ**—অভিলষিত; **তু**—কিন্তু; **উত্তরায়ণঃ**—সূর্যের উত্তরায়ণ কাল, যখন সূর্য উত্তর দিগন্ত অভিমুখী হয়ে থাকে।

অনুবাদ

যখন বৃত্তি অনুযায়ী কর্তব্য-কর্মের বিষয়ে ভীষ্মদেব উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সূর্যের গতিপথ উত্তর গোলার্ধের অভিমুখী হয়। সিদ্ধযোগীরা যাঁরা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুবরণ করতে চান, তাঁরা এই বিশেষ সময়টির অভিলাষ করে থাকেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধ যোগীরা তাঁদের ইচ্ছানুসারে উপযুক্ত সময়ে জড় শরীর ত্যাগ করে তাঁদের ঈপ্সিত লোকে যেতে পারেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৮/২৪) বলা হয়েছে যে স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের স্বার্থের অনুকূলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছেন, তিনি অগ্নিদেবের জ্যোতি বিকিরণের সময় এবং উত্তরায়ণের সময় সাধারণত তাঁর দেহত্যাগ করে চিজ্জগতে গমন করেন। বেদে এই প্রকার সময়কে দেহত্যাগ করার পক্ষে শুভ বলে বিবেচনা করা হয়েছে, এবং সিদ্ধ যোগীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। যোগসিদ্ধির অর্থ হচ্ছে এই প্রকার উচ্চতর মানসিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, যার ফলে ইচ্ছানুসারে শরীর ত্যাগ করা যায়। যোগীরা কোনরকম ভৌতিক যানের সাহায্য ব্যতীতই পলকের মধ্যে যে কোন লোকে পৌঁছতে পারেন। তাঁরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ লোকে পৌঁছাতে পারেন, যা জড়বাদীদের পক্ষে অসম্ভব। ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ মাইল গতিতে ভ্রমণ করলেও সর্বোচ্চ লোকে পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগবে। এটি একটি ভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান, এবং ভীষ্মদেব ভালভাবেই তার সদ্ব্যবহার করতে জানতেন। তিনি তাঁর জড়দেহ ত্যাগ করার জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করছিলেন, এবং তিনি যখন তাঁর মহান পৌত্র পাণ্ডবদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সেই সুবর্ণ সুযোগটি উপস্থিত হয়েছিল। তিনি এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পুণ্যাত্মা পাণ্ডবগণ, ভগবান ব্যাসদেব প্রমুখ মহর্ষিগণ আদি সমস্ত মহাত্মাদের সমক্ষে তাঁর দেহত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণী-
র্বিমুক্তসঙ্গং মন আদিপুরুষে ।
কৃষ্ণে লসৎপীতপটে চতুর্ভুজে
পুরঃস্থিতেঽমীলিতদৃগ্ব্যধারয়ৎ ॥ ৩০ ॥

তদা—তখন; **উপসংহৃত্য**—প্রত্যাহার করে; **গিরঃ**—বাক্য; **সহস্রণীঃ**—ভীষ্মদেব (যিনি শত সহস্র বিজ্ঞান এবং কলা-কৌশলে নিপুণ ছিলেন); **বিমুক্ত-সঙ্গম্**—সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে; **মনঃ**—মন; **আদি-পুরুষে**—পরমেশ্বর ভগবানে; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **লসৎ-পীত-পটে**—পীতবসন শোভিত; **চতুর্ভুজে**—চতুর্ভুজ নারায়ণে; **পুরঃ**—সমক্ষে; **স্থিতে**—দণ্ডায়মান; **অমীলিত**—অনিমেষ; **দৃক্**—নয়নে; **ব্যধারয়ৎ**—নিবিষ্ট করেছিলেন।

অনুবাদ

অবিলম্বে সেই ব্যক্তিটি, যিনি সহস্র অর্থ সমন্বয়ে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন, যিনি সহস্র সহস্র রণাঙ্গনে সংগ্রাম করেছিলেন এবং সহস্র সহস্র মানুষকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি বাক্য রোধ করলেন এবং সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সমস্ত বিষয় থেকে তাঁর মন প্রত্যাহার করে নিলেন; তাঁর নয়ন-সমক্ষে যে দীপ্তিময় উজ্জ্বল পীতবসনধারী চতুর্ভুজ আদি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর দিকে তখন প্রসারিত নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলেন।

তাৎপর্য

তাঁর জড় শরীর ত্যাগ করার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভীষ্মদেব মনুষ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মৃত্যুর সময় যে বিষয় মানুষকে আকৃষ্ট করে, সেই অনুসারে তাঁর পরবর্তী জীবন শুরু হয়। তাই কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হন, তাহলে তিনি যে নিশ্চিতভাবে ভগবানের ধামে ফিরে যাবেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (৮/৫-১৫)—

৫) মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

৬) মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

৭) অতএব, হে অর্জুন, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর, তাহলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে।

৮) হে পার্থ, অভ্যাস যোগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিত্তে যিনি আমার ধ্যান করেন, তিনি অবশ্যই আমাকেই প্রাপ্ত হবেন।

৯) সর্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, জড় বুদ্ধির অতীত, অচিন্ত্য পুরুষরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এবং এই জড়া-প্রকৃতির অতীত।

১০) যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চল চিত্তে ভক্তি সহকারে পূর্ব যোগাভ্যাস বশত ভ্রুযুগলের মধ্যে প্রাণকে স্থিত করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

১১) বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা যাঁকে 'অক্ষর' বলে অভিহিত করেন, বিষয়াসক্তিশূন্য সন্ন্যাসীরা যাঁকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারীরা যাঁকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাঁর কথা আমি তোমাকে বলব।

১২) ইন্দ্রিয়ের সব কটি দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে ভ্রু-দ্বয়ের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থিত হতে হয়।

১৩) যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরমা গতি লাভ করবেন।

১৪) যিনি একাগ্র চিত্তে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্তযোগীদের কাছে সুলভ হই।

১৫) মহাত্মাগণ, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ, আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।

শ্রীভীষ্মদেব তাঁর ইচ্ছানুসারে শরীর ত্যাগ করার সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, এবং মৃত্যুর সময় তাঁর সম্মুখে তাঁর অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং উপস্থিত থাকার মহা সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর উন্মীলিত নেত্র তাঁর উপর নিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের প্রভাবে তিনি দীর্ঘকাল ধরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই যোগের বিশদ ক্রিয়াকলাপের আবশ্যকতা তাঁর ছিল না। সরল ভক্তিযোগই সিদ্ধি লাভের জন্য যথেষ্ট। তাই প্রেমাস্পদ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করাই ছিল ভীষ্মদেবের ঐকান্তিক বাসনা, এবং ভগবানের কৃপায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার মুহূর্তে ভীষ্মদেবের সেই সৌভাগ্য হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতাশুভ-
স্তদীক্ষয়ৈবাশু গতায়ুধশ্রমঃ ।
নিবৃত্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিভ্রম-
স্তুষ্টাব জন্যং বিসৃজন্ জনার্দনম্ ॥ ৩১ ॥

বিশুদ্ধয়া—নির্মল; **ধারণয়া**—ভাবনার দ্বারা; **হত-অশুভঃ**—জড় অস্তিত্বের অশুভ বিষয়সমূহ যিনি হ্রাস করেছেন; **তৎ**—তাঁকে; **ঈক্ষয়া**—দর্শনের দ্বারা; **এব**—সহজেই; **আশু**—শীঘ্র; **গতা**—দূর হয়ে যাওয়ায়; **যুধ**—বাণসমূহ থেকে; **শ্রমঃ**—ক্লান্তি; **নিবৃত্ত**—নিরস্ত; **সর্ব**—সমস্ত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়াদি; **বৃত্তি**—কার্যকলাপ; **বিভ্রমঃ**—বিবিধভাবে যুক্ত হয়ে; **তুষ্টাব**—স্তব করেছিলেন; **জন্যম্**—জড় পিঞ্জর; **বিসৃজন্**—ত্যাগ করার সময়; **জনার্দনম্**—সমস্ত জীবের নিয়ন্তাকে।

অনুবাদ

বিশুদ্ধ ধ্যানে মগ্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করার ফলে তিনি জড় জাগতিক সমস্ত অশুভ বিষয় থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হলেন, এবং শরাঘাতে প্রাপ্ত সমস্ত দৈহিক বেদনার উপশম হল। এইভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যিক কার্যকলাপ তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং তিনি তাঁর জড়দেহ পরিত্যাগের সময় সমস্ত জীবের নিয়ন্তার উদ্দেশ্যে অপ্রাকৃতভাবে স্তব করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

জড় দেহ হচ্ছে জড়া-প্রকৃতির একটি দান, যাকে তত্ত্বগতভাবে বলা হয় মায়া। ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার জন্য আমরা এই জড় দেহের সঙ্গে একাত্মবোধ করি। ভগবান উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্মদেবের মতো শুদ্ধ ভক্তের এই মায়া অবিলম্বেই অপসারিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো, এবং মায়া বা বহিরঙ্গা জড়া-প্রকৃতি অন্ধকারের মতো। সূর্যের প্রকাশ হলে অন্ধকারের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জড় কলুষ দূরীভূত হয়েছিল এবং এইভাবে ভীষ্মদেব জড়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের কার্যকলাপ স্তব্ধ করে দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। আত্মা শুদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়গুলিও শুদ্ধ। জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হয়ে ইন্দ্রিয়গুলি অপূর্ণ ও অশুদ্ধরূপে প্রতিভাত হয়। পরম শুদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত হওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়। ভীষ্মদেব ভগবানের উপস্থিতির ফলে তাঁর জড় শরীর ত্যাগ করার পূর্বেই এই সমস্ত দিব্য অবস্থা লাভ করেছিলেন। ভগবান সমস্ত জীবের নিয়ন্তা এবং হিতকারী। সেটিই সমগ্র বেদের সিদ্ধান্ত। সমস্ত নিত্য জীবসমূহের মধ্যে তিনি হচ্ছেন পরম নিত্য এবং পরম চেতন—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্* । আর তিনিই সমস্ত জীবের সকল প্রকার প্রয়োজনসমূহ সরবরাহ করে থাকেন। এইভাবে তিনি তাঁর পরম ভক্ত ভীষ্মদেবের দিব্য অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য সমস্ত প্রকার সুযোগ প্রদান করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে ভীষ্মদেবের প্রার্থনা নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩২

শ্রীভীষ্ম উবাচ

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা
ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্তুং
প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভীষ্মঃ উবাচ—শ্রীভীষ্মদেব বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **মতিঃ**—চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা; **উপকল্পিতা**—সমর্পিত; **বিতৃষ্ণা**—সমস্ত ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা থেকে মুক্ত; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **সাত্বত-পুঙ্গবে**—ভক্তশ্রেষ্ঠ; **বিভূম্নি**—মহান; **স্ব-সুখম্**—আত্মতৃপ্তি; **উপগতে**—যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন; **ক্বচিৎ**—কখনো; **বিহর্তুম্**—অপ্রাকৃত আনন্দজনিত; **প্রকৃতিম্**—জড় জগতে; **উপেয়ুষি**—স্বীকার করেন; **যৎ-ভব**—যাঁর থেকে সৃষ্ট; **প্রবাহঃ**—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়।

অনুবাদ

ভীষ্মদেব বললেন আমার চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা, যা এতদিন বিভিন্ন বিষয় এবং বৃত্তিগত কর্তব্যে নিয়োজিত ছিল, তা এখন সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বিনিযুক্ত হোক। তিনি সর্বদা আত্মতৃপ্ত, কিন্তু কখনো কখনো ভক্তকুলশ্রেষ্ঠ-রূপে তিনি এই জড় জগতে অবতরণ করে অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করেন, যদিও এই জড় জগৎ তাঁর থেকেই সৃষ্ট হয়েছে।

তাৎপর্য

যেহেতু ভীষ্মদেব ছিলেন একজন রাষ্ট্রনেতা, কুরুবংশের প্রধান, মহারথী এবং ক্ষত্রিয় কুলের নায়ক, তাই তাঁর মন বিভিন্ন বিষয়ে পরিব্যাপ্ত ছিল; তাঁর চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা বিভিন্ন ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল। এখন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করার জন্য তাঁর চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম সত্তায় নিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এখানে তাঁকে ভক্তশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরুষ, তবুও তিনি স্বয়ং এই মর্তলোকে অবতরণ করেন তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে ভক্তিযোগরূপ বর প্রদান করার জন্য। কখনও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতরণ করেন, আবার কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে। উভয় রূপেই তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ। ভগবানের শুদ্ধভক্তদের তাঁর সেবা ছাড়া অন্য কোন বাসনা নেই,

এবং তাই তাঁদের বলা হয় *সাত্বত* । ভগবান হচ্ছেন এই সমস্ত সাত্বতদের মধ্যে প্রধান। ভীষ্মদেবের তাই অন্য কোন বাসনা ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ সমস্ত প্রকার জড় বাসনা থেকে মুক্ত হচ্ছে, ভগবান তাঁর পতি বা প্রভু হন না। বাসনাকে ত্যাগ করা যায় না, তাকে কেবল শুদ্ধ করতে হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনি তাঁর সেবায় নিরন্তরভাবে নিয়োজিত তাঁর শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় থেকে উপদেশ প্রদান করে থাকেন। এই প্রকার উপদেশ জড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রদান করা হয় না, কেবল ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার জন্যই তা করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত সাধারণ মানুষ জড়া-প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে চায়, তাদের ভগবান যে কেবল সেই কার্যের অনুমোদন ও পর্যবেক্ষণ করেন তাই নয়, তাদের ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্যও কোন প্রকার উপদেশ প্রদান করেন না। সেটিই হচ্ছে ভক্ত এবং অভক্ত উভয় প্রকার জীবের সঙ্গে ভগবানের ব্যবহারের তারতম্য। রাজ্যের রাজা যেমন বন্দী এবং মুক্ত উভয় প্রজারই শাসক, তেমনই ভগবানও সমস্ত জীবের নায়ক। কিন্তু ভক্ত এবং অভক্তের পার্থক্য অনুসারে তিনি তাদের সঙ্গে আচরণ করেন। অভক্তেরা কখনও ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করে না, এবং তাই ভগবানও তাদের ক্ষেত্রে নীরব থাকেন; যদিও তিনি তাদের সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন এবং কার্য অনুসারে ভাল বা মন্দ ফল প্রদান করে থাকেন। ভক্ত এই প্রকার জড় জাগতিক ভাল-মন্দের ঊর্ধ্বে। তারা মুক্তির পথে প্রগতিশীল, এবং তাই তাদের কোন প্রকার জড়-বাসনা নেই। ভক্ত জানেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি নারায়ণ, কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশ-প্রকাশের মাধ্যমে সমগ্র জড় সৃষ্টির মূল উৎসস্বরূপ কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হন। ভগবানও তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার বাসনা করেন, এবং তাঁদের জন্যই কেবল তিনি এই জগতে অবতরণ করেন এবং তাদের অনুপ্রাণিত করেন। ভগবান স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন। তিনি জড়া-প্রকৃতির বাধ্য নন। তাই তাঁকে এখানে *বিভু* বা সর্বশক্তিমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা তিনি জড়া-প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ নন।

শ্লোক ৩৩

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা ॥ ৩৩ ॥

ত্রি-ভুবন—ত্রিলোক; **কমনম্**—সর্বাপেক্ষা কমনীয়; **তমাল-বর্ণম্**—তমাল বৃক্ষের মতো নীলাভ বর্ণ; **রবি-কর**—সূর্যকিরণ; **গৌর**—স্বর্ণাভ বর্ণ; **বরাম্বরম্**—উজ্জ্বল বসন; **দধানে**—পরিহিত; **বপুঃ**—দেহ; **অলক-কুল-আবৃত**—কুঞ্চিত কেশরাশির দ্বারা আবৃত; **অনন-অম্বজম্**—মুখপদ্ম; **বিজয়-সখে**—অর্জুনের সখা; **রতিঃঅস্তু**—তাঁর প্রতি আসক্তি হোক; **মে**—আমার; **অনবদ্যা**—কর্মফলের বাসনারহিত।

অনুবাদ

ত্রিলোকের (স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল) মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, তমালের মতো নীলাভ বর্ণযুক্ত, সূর্যকিরণের মতো নির্মল দীপ্ত বসনে বিভূষিত এবং কুঞ্চিত কেশদামে আবৃত মুখপদ্ম সমন্বিত দিব্য শরীরধারী এই অর্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার কর্মফল-বাসনারহিত চিত্তবৃত্তি আসক্তি লাভ করুক।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর নিজ অন্তরঙ্গ আনন্দ-সুখে ধরাধামে আবির্ভূত হন, তিনি তা করে থাকেন তাঁর অন্তরঙ্গা-শক্তির সহায়তায়। তাঁর অপ্রাকৃত দেহের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ সমগ্র ত্রিভুবনে, যথা স্বর্গ, মর্ত এবং পাতালে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো এমন সুন্দর অঙ্গশ্রী নেই। তাই তাঁর অপ্রাকৃত দেহের সঙ্গে জড়ের দ্বারা সৃষ্ট বস্তুর কোন সম্পর্ক নেই। এখানে অর্জুনকে বিজয়ীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং কৃষ্ণকে তাঁর অন্তরঙ্গ সখারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় ভীষ্মদেব অর্জুনের রথের সারথিরূপে পরিহিত শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ বসনের কথা স্মরণ করছেন। যখন অর্জুন এবং ভীষ্মের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল, সেই সময় কৃষ্ণের উজ্জ্বল বসনের প্রতি ভীষ্মদেবের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল, এবং পরোক্ষভাবে তিনি তাঁর তথাকথিত প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনের প্রশংসা করেছিলেন ভগবানকে তাঁর সখারূপে লাভ করার জন্য। অর্জুন সকল সময়েই বিজয়ী ছিলেন, কেননা ভগবান ছিলেন তাঁর সখা। এই সুযোগ গ্রহণ করে ভীষ্মদেব ভগবানকে বিজয়সখে বলে সম্বোধন করেছেন, কেননা ভগবানকে যখন তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন রসে সম্পর্কিত ভক্তের নামের সঙ্গে সংযুক্তভাবে সম্বোধন করা হয় তখন তিনি প্রীত হন। যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথিরূপে বিলাস করছিলেন তখন তাঁর বসনে সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এবং এই প্রকার রশ্মি-বিচ্ছুরণের ফলে যে অপূর্ব বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল তা ভীষ্মদেব কখনও ভুলতে পারেন নি। মহারথীরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই বীর রস উপভোগ করেছিলেন। ভগবানের সঙ্গে যে কোন একটি রসের দিব্য সম্পর্কে

সম্পর্কিত হয়ে বিশেষ বিশেষ ভক্ত সর্বোচ্চ আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জড় জাগতিক মানুষেরা, যারা ভগবানের সঙ্গে এই প্রকার দিব্য সম্পর্কের ভাব কৃত্রিমভাবে প্রদর্শন করে থাকে, তারা ব্রজধামের গোপিকাদের অনুকরণ করে সরাসরি মাধুর্য রসে প্রবেশ করতে চায়। ভগবানের সঙ্গে এই প্রকার লঘু সম্পর্ক প্রদর্শন জড়বাদীদের হীন মনোবৃত্তিরই প্রকাশ করে থাকে, কেননা যারা ভগবানের সঙ্গে মাধুর্য রসের সম্পর্কের স্বাদ আস্বাদন করেছে তারা জড়-জাগতিক মিথুন সম্পর্কে কখনো আসক্ত হতে পারে না, যা এমনকি জড়বাদী নীতিবাদীদের দ্বারাও নিন্দিত হয়ে থকে। কোন বিশেষ জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সম্পর্ক বিবর্তিত হয়ে থাকে। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের প্রকৃত সম্পর্ক পাঁচটি মুখ্য রসের যে কোন একটিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, এবং প্রকৃত ভক্তের কাছে তাঁর অপ্রাকৃত তারতম্যের কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না। ভীষ্মদেব তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এবং এটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করা উচিত যে কেমনভাবে সেই মহারথী ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন।

শ্লোক ৩৪

যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্-
কচলুলিতশ্রমবার্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমান-
ত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তুকৃষ্ণ আত্মা ॥ ৩৪ ॥

যুধি—রণক্ষেত্রে; **তুরগ**—অশ্ব; **রজঃ**—ধূলি; **বিধূম্র**—ধূসরিত; **বিষ্বক্**—কুঞ্চিত; **কচ**—কেশ; **লুলিত**—অবিন্যস্ত; **শ্রমবারি**—স্বেদ; **অলঙ্কৃত**—শোভিত; **আস্যে**—মুখমণ্ডলে; **মম**—আমার; **নিশিত**—তীক্ষ্ণ; **শরৈঃ**—বাণের দ্বারা; **বিভিদ্যমান**—বিদ্ধ; **ত্বচি**—ত্বকে; **বিলসৎ**—উপভোগ্য; **কবচে**—বর্ম; **অস্তু**—হোক; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণে; **আত্মা**—মন।

অনুবাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সখ্য বশত অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন) শ্রীকৃষ্ণের আলুলায়িত কেশরাশি অশ্ব খুরোত্থিত ধূলির দ্বারা ধূসর বর্ণ ধারণ করেছিল, এবং পরিশ্রমের ফলে তাঁর মুখমণ্ডল ঘর্মবিন্দুর দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। তাঁর এই সমস্ত শোভা আমার তীক্ষ্ণ শরাঘাতের ক্ষতচিহ্নাদি দ্বারা প্রকটিত হয়ে তাঁর উপভোগ্য হয়েছিল। সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার চিত্ত ধাবিত হোক।

তাৎপর্য

ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। যখন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য এই পাঁচটি মুখ্য রসের যে কোন একটি রসে বাস্তবিক প্রেম এবং অনুরাগ সহকারে ভগবানের চিন্ময় প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা হয় ভগবান তখন তা গ্রহণ করেন। শ্রীভীষ্মদেব ছিলেন দাস্য রসে ভগবানের একজন মহান ভক্ত। তাই ভগবানের চিন্ময় শরীরের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ অন্য ভক্তের দ্বারা তাঁর প্রতি কোমল পুষ্প নিবেদনেরই সমান।

এখানে মনে হয় যে ভগবানের প্রতি ভীষ্মদেব যে আচরণ করেছিলেন সেজন্য তিনি অনুতপ্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সত্তা চিন্ময় হওয়ার ফলে তাঁর শ্রীঅঙ্গ কোনরকম বেদনা অনুভব করেনি। তাঁর দেহ জড় নয়। তিনি স্বয়ং এবং তাঁর দেহ উভয়ই সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। চেতন আত্মাকে কখনও কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, শুকানো যায় না, ভিজানো যায় না ইত্যাদি। সে কথা স্পষ্টভাবে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্কন্দ পুরাণেও সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে আত্মা সর্বদাই নিষ্কলুষ এবং অবিনাশী। তাকে কখনও ক্লেশ দেওয়া যায় না, এবং তাকে কখনও শুকানো যায় না। ভগবান শ্রীবিষ্ণু যখন অবতাররূপে আমাদের সম্মুখে প্রকট হন তখন তাঁকে জড় বিষয়ে লিপ্ত একটি বদ্ধজীবের মতো মনে হয়। যারা ভগবানকে হত্যা করার জন্য সর্বদা তৎপর, এমনকি যারা তাঁকে আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে হত্যা করতে চায়, সেই অসুর বা নাস্তিকদের বিমোহিত করার জন্য তিনি এইভাবে লীলা-বিলাস করেন। কংস কৃষ্ণকে হত্যা করতে চেয়েছিল, এবং রাবণ রামচন্দ্রকে হত্যা করতে চেয়েছিল, মূর্খতাবশত তারা জানতো না যে ভগবানকে কখনও হত্যা করা যায় না, কেননা চিন্ময় বস্তু অবিনাশী।

তাই অভক্ত নাস্তিকদের কাছে ভীষ্মদেব কর্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হওয়া এক বিভ্রান্তিকর সমস্যা, কিন্তু ভক্ত বা মুক্ত আত্মাগণ তাতে বিভ্রান্ত হন না।

ভীষ্মদেব ভগবানের পরম করুণাময় ভাবের প্রশংসা করেছেন, কেননা তিনি ভীষ্মদেবের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে বিচলিত হওয়া সত্ত্বেও অর্জুনকে একলা ছেড়ে যাননি। আবার তিনি ভীষ্মদেবের মৃত্যুশয্যার নিকটে আসতেও নারাজ হননি, যদিও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ভীষ্মদেব তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিলেন। এখানে ভীষ্মদেবের অনুতাপ এবং ভগবানের করুণাময় ভাবের দৃশ্যটি অতুলনীয়।

একজন মহান আচার্য এবং মাধুর্য রসে ভগবানের ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে এক অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে

ভীষ্মদেবের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভগবানের দেহ যে আহত হয়েছিল, তা ভগবানের কাছে সম্ভোগেচ্ছার প্রবল আবেগের ফলে প্রেমিকার দংশনের মতো আনন্দদায়ক। প্রেমিকার দ্বারা এই প্রকার দংশন শত্রুতার লক্ষণ বলে মনে হয় না, যদিও তার ফলে দেহ ক্ষত হয়। তাই ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত শ্রীভীষ্মদেবের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা ছিল দিব্য আনন্দের আদান-প্রদান। আর তা ছাড়া, যেহেতু ভগবানের শরীর এবং ভগবান অভিন্ন, তাই তাঁর সেই চিন্ময় শরীরে আঘাতের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যে ক্ষত তা সাধারণ মানুষের পক্ষে ভ্রান্তিজনক, কিন্তু পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁর সামান্য জ্ঞানও আছে, তিনি বুঝতে পারেন যে সেটি হচ্ছে বীর রসের চিন্ময় আদান-প্রদান। ভীষ্মদেবের তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যে ক্ষত উৎপন্ন হয়েছিল তার ফলে ভগবান পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়েছিলেন। *বিভিদ্যমান* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ভগবানের ত্বক ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। যেহেতু আমাদের ত্বক আমাদের আত্মা থেকে ভিন্ন, তাই আমাদের বেলায় *বিভিদ্যমান* বা আহত হওয়া বা কাটা অত্যন্ত উপযুক্ত শব্দ হত। চিন্ময় আনন্দ বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য সমন্বিত এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বৈচিত্র্য চিন্ময় আনন্দের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। যেহেতু জড় জগতে সবকিছুই গুণগতভাবে জড়, তাই তা ভ্রান্তিপূর্ণ। কিন্তু চিন্ময় স্তরে যেহেতু সবকিছুই চিন্ময়, সেখানে বিভিন্ন প্রকার আনন্দ রয়েছে যাতে কোন প্রকার উন্মত্ততা নেই। ভগবানের মহান ভক্ত ভীষ্মদেবের দ্বারা আহত হয়ে ভগবান আনন্দ উপভোগ করেছেন, এবং যেহেতু ভীষ্মদেব হচ্ছেন বীর রসের ভক্ত, তাই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের রূপের প্রতি তিনি তাঁর মনকে একাগ্রীভূত করেছেন।

শ্লোক ৩৫

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে
নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য ।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা
হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু ॥ ৩৫ ॥

সপদি—রণাঙ্গনে; **সখি-বচঃ**—সখার আদেশে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **মধ্যে**—মধ্যস্থলে; **নিজ**—তাঁর নিজের; **পরয়োঃ**—বিপক্ষের; **বলয়োঃ**—শক্তি; **রথম্**—রথ; **নিবেশ্য**—প্রবেশ করে; **স্থিতবতি**—অবস্থান করার সময়; **পর-সৈনিক**—বিপক্ষ সৈনিকদের; **আয়ুঃ**—আয়ু; **অক্ষ্ণা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **হৃতবতি**—হরণ করেছিলেন; **পার্থ**—পৃথাপুত্র (কুন্তীপুত্র) অর্জুনের; **সখে**—সখাকে; **রতিঃ**—অন্তরঙ্গ সম্পর্ক; **মম**—আমার; **অস্তু**—হোক্ ।

অনুবাদ

অর্জুনের আদেশ পালনার্থে তাঁর সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন এবং দুর্যোধনের সৈন্যদের মাঝখানে তাঁর রথটি নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তখন সেখানে তাঁর কৃপা-কটাক্ষের দ্বারাই বিপক্ষ দলের আয়ু হরণ করে নিলেন। শত্রুর দিকে শুধুমাত্র তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলেই তা সাধিত হল। আমার চিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হোক্।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১/২১-২৫) অর্জুন অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আদেশ দিয়েছেন তাঁর রথ দুই পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে স্থাপন করতে। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, যুদ্ধে যে সমস্ত শত্রুদের সঙ্গে তাঁকে বোঝাপড়া করতে হবে তাদের নিরীক্ষণ শেষ না করা পর্যন্ত রথটি যেন তিনি সেখানেই রাখেন। ভগবানকে সে কথা বলা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা করেছিলেন, ঠিক একজন আজ্ঞাবাহকের মতো। ভগবান বিরোধী পক্ষের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দেখিয়ে বলেছিলেন, "এখানে ভীষ্ম, এখানে দ্রোণ," ইত্যাদি। পরম আত্মা হওয়ার ফলে ভগবান কারোরই আজ্ঞাবাহক অথবা আদেশপালক নন, তা তিনি যেই হোন না কেন। কিন্তু তাঁর স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি কখনো কখনো একজন প্রতীক্ষমান ভৃত্যের মতো তাঁর ভক্তের আদেশ পালন করেন। ভক্তের আদেশ পালন করে ভগবান প্রসন্ন হন, ঠিক যেন পিতা তার শিশুপুত্রের আদেশ পালন করে তৃপ্তি লাভ করে। ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মধ্যে শুদ্ধ চিন্ময় প্রেমের ফলে তা সম্ভব, এবং ভীষ্মদেব সে কথা ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি ভগবানকে *পার্থসখে* বলে সম্বোধন করেছেন।

ভগবান তাঁর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা বিরোধী পক্ষের আয়ু হ্রাস করেছিলেন। কথিত হয় যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সমস্ত যোদ্ধারা তাঁদের মৃত্যুর সময়ে সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে দর্শন করার ফলে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাই অর্জুনের শত্রুদের আয়ু হ্রাস করার অর্থ এই নয় যে ভগবান অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিরোধী দলের প্রতি কৃপাপরায়ণ ছিলেন, কেননা তাঁরা যদি সাধারণভাবে তাঁদের গৃহে দেহত্যাগ করতেন, তাহলে তাঁরা মুক্তি লাভ করতেন না। এখানে মৃত্যুর সময় ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ হয়েছিল এবং তার ফলে তাঁরা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাই ভগবান হচ্ছেন সর্বমঙ্গলময়, এবং তিনি যা করেন তা সকলের মঙ্গলের জন্যই। আপাতদৃষ্টিতে সেই আয়োজন হয়েছিল তাঁর অন্তরঙ্গ সখা অর্জুনের বিজয়ের জন্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল

অর্জুনের শত্রুদের মঙ্গলের জন্য। ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ এমনই, এবং তা যিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন তিনিও তাঁর দেহত্যাগের পর মুক্তি লাভ করেন। ভগবান কোন অবস্থাতেই ভুল করেন না, কেননা তিনি পরম তত্ত্ব হওয়ার ফলে সর্বদাই সর্বমঙ্গলময়।

শ্লোক ৩৬

ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য
স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া য-
শ্চরণরতিঃ পরমস্য তস্য মেঽস্তু ॥ ৩৬ ॥

ব্যবহিত—দূরে অবস্থিত হয়ে; **পৃতনা**—সৈন্যগণ; **মুখম্**—মুখগুলি; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **স্ব-জন**—আত্মীয়-স্বজনদের; **বধাৎ**—বধজনিত; **বিমুখস্য**—বিমুখ; **দোষ-বুদ্ধ্যা**—কলুষিত বুদ্ধিবৃত্তি; **কুমতিম্**—কুবুদ্ধি; **অহরৎ**—দূর করেছিলেন; **আত্ম-বিদ্যয়া**—অপ্রাকৃত জ্ঞানের প্রভাবে; **যঃ**—যিনি; **চরণ**—চরণে; **রতিঃ**—আকর্ষণ; **পরমস্য**—পরমেশ্বরের; **তস্য**—তাঁর; **মে**—আমার; **অস্তু**—হোক।

অনুবাদ

দূরস্থিত বৃহৎ সেনাবাহিনীর মুখগুলি এবং সেই সেনাবাহিনীর অগ্রভাগস্থিত স্বজন বীরপুরুষদের দর্শন করে আপাত অজ্ঞানের ফলে কলুষিত বুদ্ধির প্রভাবে অর্জুন যখন মনে করেছিলেন যে আত্মীয়-স্বজনের বিনাশের ফলে তাঁর পাপ হবে, তখন অপ্রাকৃত জ্ঞান দান করে যিনি সেই অজ্ঞানতা দূর করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম আমার আসক্তির বিষয় হোক।

তাৎপর্য

রাজা এবং সেনাপতিদের যুদ্ধের সময় সৈন্যদের সম্মুখে থাকতে হত। সেটি প্রকৃত যুদ্ধের প্রথা। রাজা এবং সেনাপতিরা এখনকার মতো তথাকথিত রাষ্ট্রপতি বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন না। সাধারণ সৈনিক এবং ভাড়াটে সৈনিকেরা যখন শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হত, তখন তাঁরা বাড়িতে বসে থাকতেন না। সেটি আধুনিক গণতন্ত্রের রীতি হতে পারে, কিন্তু যখন প্রকৃত রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তখন যোগ্যতার বিচার না করে কতকগুলি কাপুরুষকে ভোট দিয়ে রাজপদে অভিষিক্ত করা হত না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্পষ্টভাবেই দেখা গিয়েছিল যে দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জুন,

দুর্যোধন আদি উভয় পক্ষের নেতারা কেউই ঘুমোচ্ছিলেন না; তাঁরা সকলেই সক্রিয়ভাবে সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রটি মনোনয়ন করা হয়েছিল লোকালয় থেকে বহু দূরে। তা থেকে বোঝা যায় যে নির্দোষ নাগরিকেরা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের মধ্যে যুদ্ধের সমস্ত প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকতেন। সেই যুদ্ধে যে কি হবে তা দেখার আবশ্যকতা নাগরিকদের ছিল না। তাদের কর্তব্য ছিল উপার্জনের এক-চতুর্থাংশ শাসককে দেওয়া, তা তিনি অর্জুনই হন বা দুর্যোধন হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উভয় পক্ষের সেনাপতিরাই সামনা-সামনি দাঁড়িয়েছিলেন, এবং গভীর সহানুভূতি সহকারে অর্জুন তাঁদের দেখেছিলেন এবং অনুতাপ করেছিলেন যে সাম্রাজ্যলাভের জন্য তিনি সেই যুদ্ধে তাঁর সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। দুর্যোধনের বিশাল সেনাবাহিনীর ভয়ে তিনি ভীত হননি, পক্ষান্তরে ভগবানের একজন কৃপাপরায়ণ ভক্তরূপে, জড়-জাগতিক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ যাঁর কাছে স্বাভাবিক, তিনি জাগতিক বিষয় লাভের জন্য যুদ্ধ না করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানের অভাবের ফলে তিনি এইভাবে বিবেচনা করেছিলেন, এবং তাই এখানে বলা হয়েছে যে তাঁর বুদ্ধি কলুষিত হয়েছিল। তাঁর বুদ্ধি অবশ্য কখনোই কলুষিত হতে পারে না, কেননা তিনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত এবং ভগবানের নিত্য সঙ্গী, যা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্জুনের বুদ্ধি আপাতদৃষ্টিতে কলুষিত হয়েছে, কেননা তা না হলে দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ কলুষিত বদ্ধ জীবদের কল্যাণের জন্য *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপদেশ দেওয়ার সুযোগ হত না। এই জগতের বদ্ধজীবদের জন্য *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* দান করা হয়েছিল যাতে তারা দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ভগবান *আত্মবিদ্যা* দান করেছিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থানের সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য।

শ্লোক ৩৭

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

স্ব-নিগমম্—নিজের সত্য নিষ্ঠা; **অপহায়**—পরিত্যাগ করে; **মৎ-প্রতিজ্ঞাম্**—আমার প্রতিজ্ঞা; **ঋতম্**—বাস্তব; **অধি**—অধিক; **কর্তুম্**—করার জন্য; **অবপ্লুতঃ**—নেমে এসে;

রথস্থঃ—রথ থেকে; **ধৃত**—গ্রহণ করে; **রথ**—রথের; **চরণঃ**—চাকা; **অভ্যয়াৎ**—ছুটে গিয়েছিলেন; **চলদ্‌গুঃ**—পৃথিবী কম্পিত করে; **হরিঃ**—সিংহ; **ইব**—মতো; **হন্তুম্**—হত্যা করার জন্য; **ইভম্**—হস্তী; **গত**—পতিত; **উত্তরীয়ঃ**—উত্তরীয়।

অনুবাদ

আমার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য তিনি তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেও রথ থেকে নেমে এসে রথের চাকা তুলে নিয়েছিলেন এবং হস্তিকে বধ করার জন্য প্রবল বেগে ধাবমান সিংহের মতো পৃথিবী কম্পিত করে তিনি আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর উত্তরীয়খানিও তাঁর শরীর থেকে পথে পড়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সামরিক নীতির ভিত্তিতে সংঘটিত হলেও তা বন্ধুদের মধ্যে লড়াইয়ের মতো খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে হয়েছিল। দুর্যোধন ভীষ্মদেবের সমালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে অর্জুনের প্রতি বাৎসল্য স্নেহের বশে তিনি তাঁকে হত্যা করতে চাইছেন না। যুদ্ধ করার ব্যাপারে ক্ষত্রিয় কখনো কোনরকম অপমান সহ্য করতে পারে না। ভীষ্মদেব তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তার পরের দিন বিশেষ অস্ত্রের দ্বারা পঞ্চপাণ্ডবদের বধ করবেন। দুর্যোধন তা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিল, এবং সে সেই বাণগুলি পরের দিন যুদ্ধের সময় তাঁকে দেওয়ার জন্য নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। অর্জুন কৌশলে সেই বাণগুলি দুর্যোধনের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল, এবং ভীষ্মদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে সেটি ছিল শ্রীকৃষ্ণের ছলনা। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পরের দিন কৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করতে হবে, নতুবা তাঁর সখা অর্জুনের মৃত্যু হবে। পরের দিন ভীষ্মদেব এমন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করেছিলেন যে অর্জুন এবং কৃষ্ণ উভয়েই সঙ্কটে পড়েছিলেন। অর্জুন প্রায় পরাজিত হয়েছিলেন; পরিস্থিতি এমনই সঙ্কটজনক হয়েছিল যে পরমুহূর্তেই অর্জুন ভীষ্মদেব কর্তৃক নিহত হতেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তখন মনে হয়েছিল যে তিনি তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না এবং কোন পক্ষের হয়েই তাঁর শক্তি ব্যবহার করবেন না। কিন্তু অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য তিনি রথ থেকে নেমে এসেছিলেন এবং রথের চাকা তুলে নিয়ে হস্তিকে বধ করার জন্য একটি ধাবমান সিংহের মতো ক্রোধান্বিতভাবে দ্রুতবেগে ভীষ্মদেবের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন।

তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ ॥

কখনও সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার জন্য আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। ভগবানের দাসের অনুদাসের দাস হওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন (*গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ*)। এটিই ভগবানের সমীপবর্তী হওয়ার বিধি। প্রথমে শ্রীগুরুদেবের সেবা করতে হয়, যাতে তাঁর কৃপায় ভগবানের সেবা করা যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*—শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয়। এটিই সাফল্যের রহস্য। প্রথমে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত, এবং তারপর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো*। নিজের মনগড়া উপায়ে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রথমে শ্রীগুরুদেবের সেবা করতে প্রস্তুত হতে হয় এবং তারপর যোগ্য হলে আপনা থেকেই ভগবানের সেবা করার স্তর লাভ হয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ প্রস্তাব করেছেন যে, তিনি যেন নারদ মুনির সেবায় যুক্ত হতে পারেন। তিনি কখনও সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব করেননি। এটিই যথার্থ সিদ্ধান্ত। তাই তিনি বলেছেন, *সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্*—"যাঁর কৃপায় আমি প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে দর্শন করতে সমর্থ হয়েছি, আমার সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা আমি কিভাবে ত্যাগ করতে পারি? প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যেন তাঁর শ্রীগুরুদেব নারদ মুনির সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকতে পারেন।

শ্লোক ২৯

মৎপ্রাণরক্ষণমনন্ত পিতুর্বধশ্চ
মন্যে স্বভৃত্যঋষিবাক্যমৃতং বিধাতুম্ ।
খড়্গং প্রগৃহ্য যদবোচদসদ্বিধিৎসু-
স্ত্বামীশ্বরো মদপরোঽবতু কং হরামি ॥ ২৯ ॥

মৎ-প্রাণ-রক্ষণম্—আমার জীবন রক্ষা করে; **অনন্ত**—হে অনন্ত, অন্তহীন চিন্ময় গুণের উৎস; **পিতুঃ**—আমার পিতার; **বধঃ চ**—এবং হত্যা করে; **মন্যে**—আমি

ভক্ত ভীষ্মদেবের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্যই তিনি সেইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই আচরণের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ভক্ত ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর শত্রুতা করারও অভিনয় করে। ভগবান পরম তত্ত্ব হওয়ার ফলে তাঁর শত্রুর ভূমিকায় অভিনয়কারী শুদ্ধ ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের কোন শত্রু থাকতে পারে না, এবং তথাকথিত শত্রু কখনো তাঁর অনিষ্টও করতে পারে না, কেননা তিনি হচ্ছেন *অজিত* । কিন্তু তবুও তাঁর শুদ্ধ ভক্ত যখন একজন শত্রুর মতো তাঁকে প্রহার করে অথবা উচ্চপদ থেকে তাঁকে তিরস্কার করে, তখন তিনি সেই আচরণের ফলে আনন্দ উপভোগ করেন, যদিও ভগবানের থেকে উচ্চতর আর কেউ হতে পারে না। এইগুলি হচ্ছে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অপ্রাকৃত আচরণের আদান-প্রদান। আর যাদের শুদ্ধ ভক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, তারা এই আচরণের রহস্য ভেদ করতে পারে না। ভীষ্মদেব একজন বীর যোদ্ধার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, এবং তিনি জ্ঞাতসারে ভগবানের শরীর বাণের দ্বারা বিদ্ধ করেছিলেন, যাতে সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় যেন ভগবান আহত হয়েছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কেবল অভক্তদের বিভ্রান্ত করার জন্য। ভগবানের পূর্ণ চিন্ময় দেহ কখনো আহত হতে পারে না, এবং ভক্তও কখনো ভগবানের শত্রু হতে পারেন না। তা যদি হত তাহলে ভীষ্মদেব কখনো সেই ভগবানকে তাঁর জীবনের পরম গতি বলে আকাঙ্ক্ষা করতেন না। ভীষ্মদেব যদি ভগবানের শত্রু হতেন, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনা প্রয়াসে তাঁকে হত্যা করতে পারতেন। তাঁকে রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় ভীষ্মদেবের সম্মুখে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তা তিনি করেছিলেন কারণ শুদ্ধ ভক্ত কর্তৃক উৎপন্ন আঘাতের দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবানের চিন্ময় সৌন্দর্য তাঁর যোদ্ধাভক্ত দর্শন করতে চেয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে ভগবান এবং তাঁর সেবকের মধ্যে চিন্ময় রস বিনিময়ের পন্থা। এই প্রকার বিনিময়ের ফলে ভগবান এবং তাঁর ভক্ত তাঁদের নিজ নিজ স্থানে মহিমামণ্ডিত হন। ভগবান এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে ভীষ্মদেবের প্রতি ধাবিত হওয়ার সময়ে অর্জুন তাঁকে বাধা দান করা সত্ত্বেও তিনি ভীষ্মদেবের প্রতি ধাবিত হন, ঠিক যেভাবে একজন প্রেমিক সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তার প্রেমিকার প্রতি ধাবিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল তিনি যেন ভীষ্মদেবকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সেই আচরণ ছিল তাঁর মহান ভক্তকে প্রসন্ন করার জন্যই। ভগবান নিঃসন্দেহে সমস্ত বদ্ধজীবদের পরিত্রাণকারী। নির্বিশেষবাদীরা তাঁর কাছে মুক্তি চায়, এবং তিনি তাদের বাসনা অনুসারে তাদের পুরস্কৃত করেন, কিন্তু এখানে ভীষ্মদেব ভগবানকে তাঁর স্বরূপে দর্শন করার অভিলাষ করেছেন। ভগবানের সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরাই এই অভিলাষ করেন।

ভগবান *ভগবদ্গীতায়* তাঁর বাণী (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*) এবং তাঁর ভক্ত নারদের বাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন। ভগবান তাঁর একটি কার্যের দ্বারা বহু উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। তাই হিরণ্যকশিপুর সংহার এবং প্রহ্লাদ মহারাজের রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান ভক্তের বাণীর সত্যতা এবং ভগবানের নিজের প্রভুত্ব, এই সমস্ত উদ্দেশ্য একসঙ্গে সাধন হয়েছিল। ভগবান তাঁর ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার জন্য কার্য করেন; তা ছাড়া তাঁর কোন কিছু করার আবশ্যকতা হয় না। বৈদিক ভাষায় বলা হয়েছে, *ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে*—ভগবানকে কিছুই করতে হয় না, কারণ সব কিছুই তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। ভগবানের অনন্ত শক্তি, যার দ্বারা তিনি সব কিছু সম্পাদন করেন। তাই তিনি যখন স্বয়ং কোন কিছু করেন, তা কেবল তাঁর ভক্তের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। ভগবানের আরেক নাম ভক্তবৎসল, কারণ তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ।

শ্লোক ৩০

একস্ত্বমেব জগদেতমমুষ্য যৎ ত্ব-
মাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্যসি মধ্যতশ্চ ।
সৃষ্ট্বা গুণব্যতিকরং নিজমায়য়েদং
নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ ॥ ৩০ ॥

একঃ—এক; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—কেবল; **জগৎ**—জড় জগৎ; **এতম্**—এই; **অমুষ্য**—তার (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের); **যৎ**—যেহেতু; **ত্বম্**—আপনি; **আদি**—শুরুতে; **অন্তয়োঃ**—অন্তে; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **অবস্যসি**—(কারণরূপে) বিরাজ করেন; **মধ্যতঃ চ**—আদি এবং অন্তের মধ্যবর্তী অবস্থায়; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে; **গুণ-ব্যতিকরম্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বিকার; **নিজ-মায়য়া**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **ইদম্**—এই; **নানা ইব**—বিবিধ প্রকার; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা (গুণের দ্বারা); **অবসিতঃ**—প্রতীত; **তৎ**—তা; **অনুপ্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি নিজেকে সমগ্র জগৎরূপে প্রকাশিত করেন, কারণ সৃষ্টির পূর্বে আপনি ছিলেন, সৃষ্টির পরে আপনি থাকেন, এবং আদি ও অন্তের মধ্যবর্তী

একজন সেনানায়করূপে তিনি নিরন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের রথের সারথি বা পার্থসারথিরূপে ভগবানকে স্মরণ করেছিলেন। তাই ভগবানের পার্থসারথি লীলাও নিত্য। কংসের কারাগারে তাঁর জন্ম-লীলা থেকে অন্তিমে মৌশল-লীলা পর্যন্ত ভগবানের সমস্ত লীলাই একে একে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে আবর্তিত হয়, ঠিক যেমন ঘড়ির কাঁটা এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে ঘুরে চলে। আর এই সমস্ত লীলায় পাণ্ডব এবং ভীষ্মদেবের মতো ভগবানের সমস্ত পার্ষদেরা তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাই ভীষ্মদেব পার্থসারথিরূপে ভগবানের সুন্দর স্বরূপ কখনও ভুলতে পারেননি, যা এমনকি অর্জুন পর্যন্ত দর্শন করতে পারেননি। অর্জুনের অবস্থান ছিল ভগবানের সুন্দর পার্থসারথি রূপের পিছনে, কিন্তু ভীষ্মদেব ছিলেন ঠিক ভগবানের সম্মুখেই। ভগবানের সেনাবেশী রূপ ভীষ্মদেব অর্জুনের থেকেও অধিক আনন্দ সহকারে দর্শন করেছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত সৈনিক এবং ব্যক্তিরা তাঁদের মৃত্যুর পর ভগবানের মতো তাঁদের চিন্ময় স্বরূপ লাভ করেছিলেন, কেননা তাঁরা তখন প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পেরেছিলেন। জলচর থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত বিবর্তনের চক্রে আবর্তিত বদ্ধজীবের সমস্ত রূপ হচ্ছে *মায়া,* অর্থাৎ কর্মের ফলে লব্ধ জড়া-প্রকৃতির দান। বদ্ধজীবের জড় দেহগুলি কৃত্রিম বহিরাগত আবরণের মতো, এবং বদ্ধজীব যখন জড়া-প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন সে তার প্রকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হতে চায়, কিন্তু ভগবানের অংশ-স্বরূপ চিৎ স্ফুলিঙ্গের পক্ষে তা মোটেই স্বাভাবিক নয়। তাই নির্বিশেষবাদীরা পুনরায় অধঃপতিত হয়ে জড় রূপ প্রাপ্ত হয়, যা চিন্ময় আত্মার পক্ষে অর্থহীন। ভগবদ্ভক্ত তাঁর আত্মার স্বরূপ অনুসারে বৈকুণ্ঠলোকে অথবা গোলোকে ভগবানের মতো চতুর্ভুজ অথবা দ্বিভুজ চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হন। সম্পূর্ণ চিন্ময় এই রূপই হচ্ছে জীবের স্বরূপ, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উভয় পক্ষেই যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁরা তাঁদের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা ভীষ্মদেব এখানে প্রতিপন্ন করেছেন। তাই ভগবান কেবল পাণ্ডবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ ছিলেন না, তিনি অপরপক্ষের প্রতিও কৃপাপরায়ণ ছিলেন, কেননা তাঁরা সকলেই একই ফল লাভ করেছিলেন। ভীষ্মদেবও সেই সুযোগ চেয়েছিলেন, এবং যদিও ভগবানের পার্ষদরূপে তাঁর স্থিতি সর্ব অবস্থাতেই নিশ্চিত হয়েছে, তথাপি সেটিই ছিল ভগবানের কাছে তাঁর প্রার্থনা। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, অন্তরে অথবা বাইরে ভগবানকে দর্শন করে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হন, যা হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি।

শ্লোক ৪০

ললিতগতিবিলাসবল্গুহাস-
প্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ
প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ॥ ৪০ ॥

ললিত—সুন্দর; **গতি**—গমনভঙ্গি; **বিলাস**—মনোমুগ্ধকর; **বল্গুহাস**—মধুর হাস্য; **প্রণয়**—প্রেমপূর্ণ; **নিরীক্ষণ**—দৃষ্টিপাত; **কল্পিত**—মনোভাব; **উরুমানাঃ**—মহা মহিমান্বিত; **কৃত-মনু-কৃতবত্যঃ**—গমনের অনুকরণ করে; **উন্মদান্ধাঃ**—আনন্দের আতিশয্যে উন্মত্ত; **প্রকৃতিম্**—স্বরূপ; **অগন্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **কিল**—অবশ্যই; **যস্য**—যাঁর; **গোপ-বধ্বঃ**—গোপকন্যাগণ।

অনুবাদ

আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হোক, যাঁর সুন্দর গমনভঙ্গি, মধুর হাস্য এবং প্রেমপূর্ণ ঈক্ষণ ব্রজগোপিকাদের আর্কষণ করেছিল। (রাসনৃত্য থেকে তাঁর অন্তর্হিত হওয়ার পর) ব্রজগোপিকারা তাঁর বিরহে উন্মত্তবৎ হয়ে তাঁর গমনভঙ্গি ও বিবিধ কার্যকলাপের অনুকরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রজভূমির বালিকারা সম স্তরে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করে, দাম্পত্য প্রেমে তাঁকে আলিঙ্গন করে, রসিকতাপূর্বক তাঁর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করে এবং প্রেমপূর্ণ নয়নে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রেমময়ী সেবার গভীর আনন্দে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। অর্জুনের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক ভীষ্মদেবের মতো ভক্তের কাছে নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক অধিক শুদ্ধ প্রেমময়ী সেবার ফলে অধিক প্রশংসনীয়। ভগবানের কৃপায় অর্জুন সারথিরূপে ভগবানের সখ্যপূর্ণ সেবা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, কিন্তু ভগবান অর্জুনকে সমান শক্তি প্রদান করেননি। কিন্তু গোপিকারা ভগবানের সমান পদ প্রাপ্ত হয়ে প্রায় ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ভীষ্মদেবের গোপীদের স্মরণ করার অভিলাষ, তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে তাঁদের কৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা যখন মহিমামণ্ডিত হন, তখন ভগবান অধিক প্রসন্ন হন, এবং তাই ভীষ্মদেব কেবল তাঁর স্নেহাস্পদ অর্জুনেরই প্রশংসা করেননি, ভগবানের প্রেমময়ী

হয়েছে, *ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে* এবং *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। এই সমস্ত বৈদিক তথ্য ইঙ্গিত করে যে, কেবল এক ভগবান রয়েছেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। মায়াবাদীরা তাদের নিজেদের মতে এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সেই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, তিনিই সব কিছু তবুও সব কিছু থেকে তিনি ভিন্ন। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। সব কিছুই এক, পরমেশ্বর ভগবান, তবুও সব কিছু ভগবান থেকে ভিন্ন। এটিই ভেদ এবং অভেদ তত্ত্ব।

এই সম্পর্কে এখানে *বসুকালবদষ্টিতর্বোঃ* দৃষ্টান্তটি উপলব্ধি করা খুবই সহজ। সব কিছুই কালে বিরাজ করে, তবুও কালের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ। বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ এক। প্রতিদিন আমরা সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যারূপে কালকে অনুভব করি, এবং যদিও সকাল দুপুর থেকে ভিন্ন এবং দুপুর সন্ধ্যা থেকে ভিন্ন, তবুও একত্রে তারা এক। কাল ভগবানেরই শক্তি, কিন্তু ভগবান কাল থেকে ভিন্ন। কালের দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, পালন হচ্ছে এবং সংহার হবে, কিন্তু পরম ঈশ্বর ভগবানের আদি নেই এবং অন্ত নেই। তিনি নিত্য শাশ্বত। সব কিছুই বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে দিয়ে যায়, তবুও ভগবান সর্বদাই একই থাকেন। এইভাবে নিঃসন্দেহে ভগবান এবং জড় সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ভিন্ন নয়। তাদের ভিন্ন বলে মনে করাকে বলা হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞান।

কিন্তু প্রকৃত একত্ব মায়াবাদীদের ধারণার তুল্য নয়। বাস্তবিক জ্ঞান হচ্ছে যে, ভেদ ভগবানের শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। বীজ বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হয় যা মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল আদি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই গেয়েছেন, *কেশব তুয়া জগত বিচিত্র*—"হে ভগবান, আপনার সৃষ্টি বৈচিত্র্যে পূর্ণ।" বৈচিত্র্য এক এবং ভিন্ন। এটিই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বদর্শন। তার সিদ্ধান্ত *ব্রহ্মসংহিতায়* দেওয়া হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"কৃষ্ণ বা গোবিন্দ পরম ঈশ্বর। তাঁর চিন্ময় দেহ নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। তিনি সব কিছুর উৎস কিন্তু তাঁর উৎস নেই, কারণ তিনি সর্বকারণের পরম কারণ।" ভগবান যেহেতু সর্বকারণের পরম কারণ, তাই সব কিছুই তাঁর সঙ্গে এক, কিন্তু যখন আমরা বিভিন্নতার বিচার করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সব কিছুই পরস্পর থেকে ভিন্ন।

করতে হত। পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করে তাঁর জায়গায় অন্য রাজার আসন পেতে দিতে হত। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করার জন্য অশ্ব ছেড়েছিলেন, এবং পৃথিবীর সমস্ত শাসনকারী রাজা এবং রাজকুমারেরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্ব বরণ করে নিয়েছিলেন। তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অধীনস্থ পৃথিবীর এই সমস্ত শাসকেরা এক মহান রাজসূয় যজ্ঞে অংশগ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হত, তাই কোন ক্ষুদ্র রাজার পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। এই প্রকার যজ্ঞ অত্যন্ত ব্যয় বহুল এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠান করা কঠিন বলে, এই কলিযুগে তা অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া এই যজ্ঞের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মতো সুদক্ষ পুরোহিতও পাওয়া সম্ভব নয়।

পৃথিবীর সমস্ত রাজা এবং মহাজ্ঞানী ঋষিরা এইভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজধানীতে সমবেত হয়েছিলেন। মহান দার্শনিক, ধর্মবিদ্, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং মহর্ষি সমন্বিত সমগ্র বিদ্বৎ সমাজ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, এবং সেই সভায় তাঁরা সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বৈশ্য এবং শূদ্রেরা সমাজের নগণ্য সদস্য বলে এখানে তাদের উল্লেখ করা হয়নি। আধুনিক যুগে সামাজিক কার্যকলাপের পরিবর্তন হওয়ার ফলে বৃত্তির ভিত্তিতে মানুষের গুরুত্বেরও পরিবর্তন হয়েছে।

সেই মহতী সভায় শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সকলের নয়নের মণি। সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, এবং তাঁরা সকলে তাঁকে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চেয়েছিলেন। ভীষ্মদেবের সেই সমস্ত কথা মনে পড়েছিল, এবং তাঁর আরাধ্য ভগবান যে তাঁর সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সেজন্য তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। সুতরাং পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান হচ্ছে তাঁর কার্যকলাপ, রূপ, লীলা, নাম এবং যশের ধ্যান। পরমেশ্বরের নির্বিশেষ রূপের ধ্যান বলে যা কল্পনা করা হয়, তার চেয়ে এই পন্থা অনেক সহজ। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১২/৫) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের নির্বিশেষ রূপের ধ্যান অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃতপক্ষে তা কোন ধ্যানই নয়, তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কেননা তাতে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু ভগবানের বাস্তব রূপ এবং লীলার ধ্যান করেন, এবং তাই ভক্তেরা ভগবানকে সহজে লাভ করতে পারেন। সে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও* (১২/৯) উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান তাঁর চিন্ময় কার্যকলাপ থেকে অভিন্ন। এই শ্লোকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে স্বীকার না করা

হলেও, তিনি যখন প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজে উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, তখন তাঁকে সেই সময়কার সবচাইতে মহান পুরুষ বলে স্বীকার করা হয়েছিল। একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর পর ভগবান বলে পূজিত হন বলে যে অপপ্রচার করা হয়, তা অত্যন্ত ভ্রান্তিজনক, কেননা মৃত্যুর পর কেউই ভগবান হতে পারে না। তেমনই আবার পরমেশ্বর ভগবান কখনও মানুষ হতে পারেন না, এমনকি যখন তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন, তখনও নয়। এই দুটি ধারণাই ভ্রান্ত। মানুষের ভগবান হওয়ার যে মতবাদ (এ্যানথ্রোপোমরফিজম্) তা কখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বেলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে না।

শ্লোক ৪২

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্ ।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোহস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৪২ ॥

তম্—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **ইমম্**—এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত; **অহম্**—আমি; **অজম্**—প্রাকৃত জন্মরহিত; **শরীর-ভাজাম্**—বদ্ধ জীবদের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ধিষ্ঠিতম্**—অধিষ্ঠিত; **আত্ম**—পরমাত্মা; **কল্পিতানাম্**—মনোধর্মীদের; **প্রতিদৃশম্**—সমস্ত দিকে; **ইব**—মতো; **ন একধা**—অনেক; **অর্কম্**—সূর্য; **একম্**—একমাত্র; **সমধি-গতঃ অস্মি**—আমি সমাধি লাভ করেছি; **বিধূত**—মুক্ত হয়ে; **ভেদ-মোহঃ**—দ্বৈতভাবের মোহমুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

এখন আমি পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে আমার সম্মুখে উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে পারি, কারণ তাঁর সম্বন্ধে আমার দ্বৈতভাবের সমস্ত মোহ এখন দূর হয়ে গেছে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও সকলের হৃদয়ে, এমনকি মনোধর্মীদের হৃদয়ে পর্যন্ত বিরাজ করেন। সূর্য ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হলেও সূর্য একটিই।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে নিজেকে বহু অংশে বিস্তার করেছেন। তাঁর অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলেই

দ্বৈত ধারণার উদয় হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৯/১১) ভগবান বলেছেন যে মূর্খরাই কেবল তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। এই প্রকার মূর্খ মানুষেরা তাঁর অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে অবগত নয়। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, ঠিক যেমন সূর্য পৃথিবীর সর্বত্র সকলের সম্মুখে বিরাজমান। ভগবানের পরমাত্মারূপে তাঁর অংশের বিস্তার। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তিনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে নিজেকে বিস্তার করেন, এবং তাঁর অঙ্গজ্যোতির দ্বারা তিনি নিজেকে ব্রহ্মজ্যোতি রূপেও বিস্তার করেন। ব্রহ্ম-সংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তাঁর অঙ্গজ্যোতি। তাই তিনি এবং তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতি, অথবা তাঁর অংশ পরমাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে সমস্ত নির্বোধ মানুষেরা সেই তত্ত্ব অবগত নয়, তারাই কেবল মনে করে যে ব্রহ্মজ্যোতি এবং পরমাত্মা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন। এই ভ্রান্ত দ্বৈত ধারণা ভীষ্মদেবের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছিল, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে কেবল সবকিছুর সর্বস্ব, তা জেনে তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন। এই জ্ঞান মহাত্মা বা ভগবদ্ভক্তেরা লাভ করেন, যে সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাসুদেবই সব কিছু এবং বাসুদেব ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। বাসুদেব বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, যা এখানে একজন মহাজন কর্তৃক প্রতিপাদিত হয়েছে, এবং তাই একজন সাধক ভক্ত এবং শুদ্ধ ভক্ত উভয়েরই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির মার্গ।

ভীষ্মদেবের আরাধ্য হচ্ছেন পার্থসারথিরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এবং সেই কৃষ্ণই বৃন্দাবনে গোপিকাদের পরম আকর্ষণীয় শ্যামসুন্দর। কখনও কখনও নির্বোধ পণ্ডিতেরা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু ভীষ্মদেবের মন থেকে সেরকম ধারণা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছিল। এমনকি নির্বিশেষবাদীদের পরম লক্ষ্যবস্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিও শ্রীকৃষ্ণ, এবং যোগীদের পরম লক্ষ্য পরমাত্মাও শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্যোতি এবং অন্তর্যামী পরমাত্মা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তা ব্রহ্মজ্যোতি অথবা পরমাত্মার সঙ্গে করা যায় না। তাঁর সবিশেষরূপে তিনি পার্থসারথি এবং বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দর উভয়ই, কিন্তু তাঁর নির্বিশেষরূপে তিনি ব্রহ্মজ্যোতিতে নেই এবং পরমাত্মাতেও নেই। ভীষ্মদেবের মতো মহাত্মাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত স্বরূপের উৎস বলে জেনে, উপলব্ধি করেন যে এই সমস্ত বিভিন্ন রূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই।

শ্লোক ৪৩

সূত উবাচ

কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্‌দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোঽন্তঃশ্বাস উপারমৎ ॥ ৪৩ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **কৃষ্ণে**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **এবম্**—কেবল; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **মনঃ**—মনের দ্বারা; **বাক্**—বাক্য; **দৃষ্টি**—দৃষ্টি; **বৃত্তিভিঃ**—ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **আত্মানম্**—জীবাত্মাকে; **আবেশ্য**—আবিষ্ট করে; **সঃ**—তিনি; **অন্তঃ-শ্বাসঃ**—শেষ নিশ্বাস; **উপারমৎ**—ত্যাগ করলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন, এইভাবে ভীষ্মদেব তাঁর মন, বাক্য ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা তাঁর চেতনাকে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার সময় ভীষ্মদেব যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাকে বলা হয় *নির্বিকল্প সমাধি,* কেননা তিনি তখন ভগবানের চিন্তায় সমাহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর চিত্ত ভগবানের লীলা স্মরণে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিল। তিনি তখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টির দ্বারা তিনি ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেছিলেন। এইভাবে তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ অবিচলিতভাবে ভগবানে একাগ্রীভূত হয়েছিল। এটিই হচ্ছে সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর, এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে সকলের পক্ষেই এই স্তর লাভ করা সম্ভব। ভগবদ্ভক্তির নটি মুখ্য অঙ্গ হচ্ছে—(১) *শ্রবণ,* (২) *কীর্তন,* (৩) *স্মরণ,* (৪) *পাদসেবন,* (৫) *অর্চন,* (৬) *বন্দন,* (৭) *দাস্য,* (৮) *সখ্য,* এবং (৯) *আত্মনিবেদন* । এই অঙ্গগুলির সবকটি কিংবা যে কোন একটি অভীষ্ট ফল প্রদানে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, তবে তা সুদক্ষ ভগবদ্ভক্তের তত্ত্বাবধানে নিরন্তর অনুশীলন করতে হয়। প্রথম অঙ্গ শ্রবণ, সব কটি অঙ্গের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাই চরমে যারা ভীষ্মদেবের মতো অবস্থা প্রাপ্ত হতে চান, সেই সমস্ত ঐকান্তিক সাধকদের পক্ষে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং তারপর *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত না থাকলেও মৃত্যুর সময় ভীষ্মদেবের মতো অপূর্ব অবস্থা লাভ করা যেতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অথবা *শ্রীমদ্ভাগবতে* লিপিবদ্ধ ভগবানের বাণী ভগবান থেকে অভিন্ন। তা হচ্ছে শব্দরূপে ভগবানের অবতার, এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে যে কোন মানুষ অষ্টবসুর অন্যতম শ্রীভীষ্মদেবের অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারেন। কোন না কোন সময়ে প্রতিটি মানুষ অথবা পশুকে অবধারিতভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়, কিন্তু ভীষ্মদেবের মতো যাঁর মৃত্যু হয়, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, আর যারা প্রকৃতির নিয়মে বাধ্য হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাদের মৃত্যু হয় পশুর মতো। এটিই হচ্ছে মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য। মনুষ্য জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভীষ্মদেবের মতো মৃত্যুবরণ করা।

শ্লোক ৪৪

সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে ।
সর্বে বভূবুস্তে তুষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে ॥ ৪৪ ॥

সম্পদ্যমানম্—মিলিত হয়ে; **আজ্ঞায়**—জানার পর; **ভীষ্মম্**—শ্রীভীষ্মদেবকে; **ব্রহ্মণি**—পরব্রহ্মে; **নিষ্কলে**—অসীম; **সর্বে**—উপস্থিত সকলে; **বভূবুঃ তে**—তাঁরা সকলে হয়েছিলেন; **তূষ্ণীম্**—মৌন; **বয়াংসি ইব**—পক্ষীর মতো; **দিন-আত্যয়ে**—দিনান্তে।

অনুবাদ

অন্তহীন পরব্রহ্মে শ্রীভীষ্মদেব মিলিত হয়েছেন জেনে সেখানে উপস্থিত সকলে দিবাবসানে পাখিদের মতো মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরম তত্ত্বের অনন্ত সত্তায় প্রবেশ করা অথবা লীন হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে জীবের প্রকৃত আলয়ে প্রবিষ্ট হওয়া। সমস্ত জীবেরা হচ্ছে অদ্বয় তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই সেবক এবং সেব্যরূপে তারা ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কিত। একটি যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি যেমন পূর্ণ যন্ত্রটির সেবা করে, ঠিক তেমনই ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশের দ্বারা সেবিত হন। কোন যন্ত্রের একটি অংশ যখন যন্ত্রটি থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তখন তার আর কোন গুরুত্ব থাকে না। তেমনই ভগবানের সেবা থেকে যখন কোন অংশ বিচ্যুত হয়ে, যায় তখন তা সম্পূর্ণরূপে

অর্থহীন হয়ে পড়ে। জড় জগতে সমস্ত জীবই পরম পূর্ণের বিচ্ছিন্ন অংশ, এবং মূল অংশের যেমন গুরুত্ব থাকে, তাদের আর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু আরও সংযুক্ত জীব রয়েছেন, যাঁরা হচ্ছেন নিত্যমুক্ত। দুর্গা-শক্তি বা কারাগারের রক্ষয়িত্রী ভগবানের জড়া শক্তি, বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অংশের তত্ত্বাবধান করেন, এবং এইভাবে তারা জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীনে বদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করে। জীব যখন সে কথা উপলব্ধি করতে পারে, তখন সে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে, এবং এইভাবে জীবের পারমার্থিক অনুপ্রেরণার সূচনা হয়। এই পারমার্থিক অনুপ্রেরণাকে বলা হয় *ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* । মুখ্যত এই *ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ভগবদ্ভক্তির দ্বারা সফল হয়। জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে ব্রহ্ম বিষয়ক প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান; বৈরাগ্যের অর্থ হচ্ছে জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি, এবং ভক্তি হচ্ছে অভ্যাসের দ্বারা জীবের স্বরূপের পুনরুদয়। যে সমস্ত সফল জীব চিজ্জগতে প্রবেশের যোগ্য, তাঁদের বলা হয় জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত। জ্ঞানী এবং যোগীরা ব্রহ্মের নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটায় প্রবেশ করেন, কিন্তু ভক্তরা বৈকুণ্ঠ নামক চিন্ময়লোকে প্রবেশ করেন। সেই সমস্ত চিন্ময়লোকে নারায়ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান আধিপত্য করেন, এবং সুস্থ, বন্ধনমুক্ত জীবেরা সেখানে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনপূর্বক সেখানে বাস করেন। মুক্ত জীবেরা সেখানে ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করেন, কিন্তু নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী এবং যোগীরা বৈকুণ্ঠলোকের নির্বিশেষ জ্যোতিতে প্রবেশ করেন। বৈকুণ্ঠের সব কটি লোক সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়, এবং বৈকুণ্ঠলোকের রশ্মিচ্ছটাকে বলা হয় ব্রহ্মজ্যোতি। এই ব্রহ্মজ্যোতি অন্তহীনভাবে বিস্তৃত এবং এই জড় জগৎ হচ্ছে সেই ব্রহ্মজ্যোতির একটি নগণ্য আচ্ছাদিত অংশ মাত্র। এই আবরণ অনিত্য, এবং তাই এটি এক প্রকার মায়া।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে ভীষ্মদেব চিজ্জগতের একটি বৈকুণ্ঠলোকে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, যেখানে ভগবান তাঁর নিত্য পার্থসারথি রূপে তাঁর নিরন্তর সেবায় যুক্ত নিত্য-মুক্ত জীবদের আরাধ্য ভগবানরূপে বিরাজ করেন। যে প্রেম এবং অনুরাগ ভগবান এবং ভক্তকে বেঁধে রাখে, তা ভীষ্মদেবের বেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল। ভীষ্মদেব পার্থসারথি রূপে ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ কখনও বিস্মৃত হননি, এবং ভীষ্মদেব যখন চিন্ময়লোকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন ভগবান স্বয়ং তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি।

সফল হতে পারে যখন আমরা অভ্রান্ত মহাজনদের অনুগমন করি। একজন ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ মানুষ কখনও এমন কোন মতবাদ সৃষ্টি করতে পারে না যা সকলের পক্ষে গ্রহণীয়। কেবল একজন পূর্ণ এবং অচ্যুত পুরুষই এমন কার্যক্রম তৈরী করতে পারেন যা পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে প্রযোজ্য এবং সকলেই যা পালন করতে পারে। নির্বিশেষ সরকার কখনও শাসন করে না, শাসন যে করে সে একজন ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিটি যদি আদর্শ এবং অভ্রান্ত হয়, তা হলে সরকার আদর্শ হবে। সেই ব্যক্তিটি যদি মূর্খ হয়, তা হলে সরকার হবে একটি মূর্খের স্বর্গ। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। অযোগ্য রাজা এবং প্রশাসকদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী রয়েছে। তাই রাষ্ট্রপ্রধানকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত, এবং সারা পৃথিবী শাসন করার পূর্ণ ক্ষমতা তার থাকা উচিত। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো আদর্শ রাজার অধীনেই কেবল সারা পৃথিবী জুড়ে একটি রাষ্ট্রের ধারণা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। তখনকার দিনে সারা পৃথিবী সুখী ছিল, কেননা তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো রাজা সারা পৃথিবী শাসন করতেন।

শ্লোক ৪

কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্বকামদুঘা মহী ।
সিষিচুঃ স্ম ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীর্মুদা ॥ ৪ ॥

কামম্—প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ; **ববর্ষ**—বর্ষিত হয়েছিল; **পর্জন্যঃ**—বৃষ্টি; **সর্ব**—সব কিছু; **কাম-দুঘা**—অভীষ্ট প্রদায়িনী; **মহী**—পৃথিবী; **সিষিচুঃ স্ম**—সিক্ত হয়েছিল; **ব্রজান্**—গো-চারণ ভূমি; **গাবঃ**—গাভী; **পয়সা উধস্বতীঃ**—স্ফীত স্তন থেকে; **মুদা**—আনন্দিত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে মেঘরাজি মানুষের প্রয়োজন মতো যথেষ্ট বারিবর্ষণ করত, এবং পৃথিবী মানুষের সমস্ত প্রয়োজনই পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ করত। দুগ্ধবতী প্রফুল্লমনা গাভীদের স্ফীত স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধে গোচারণভূমি সিক্ত হত।

তাৎপর্য

অর্থনৈতিক বিকাশের মৌলিক নীতি ভূমি এবং গাভীর উপর কেন্দ্রীভূত। মানব সমাজের আবশ্যকতাগুলি হচ্ছে খাদ্যশস্য, ফল, দুধ, খনিজ পদার্থ, বস্ত্র, কাষ্ঠ ইত্যাদি।

করা হয়। ভীষ্মদেবের প্রতি যে শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, কখনও কৃত্রিমভাবে তার অনুকরণ করা উচিত নয়, যা আজকাল যে কোন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তথাকথিত জয়ন্তী উৎসব পালন করার মতো একটা কায়দা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রামাণিক শাস্ত্রের মতে এই প্রকার জয়ন্তী উৎসব সাধারণ মানুষের জন্য নয়, তা তিনি জড়জাগতিক বিচারে যতই মহৎ হোন না কেন। সেটি ভগবানের প্রতি একটি অপরাধ, কেননা জয়ন্তী কেবল ভগবানের এই ধরাধামে আবির্ভাবের দিবসটি উদ্‌যাপন করার জন্যই নির্দিষ্ট। ভীষ্মদেবের কার্যকলাপ ছিল অলৌকিক, এবং ভগবদ্ধামে তাঁর প্রয়াণও অলৌকিক।

শ্লোক ৪৬

তস্য নির্হরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব ।
যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা মুহূর্তং দুঃখিতোঽভবৎ ॥ ৪৬ ॥

তস্য—তাঁর; **নির্হরণ-আদীনি**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **সম্পরেতস্য**—মৃতদেহের; **ভার্গব**—হে ভৃগু-বংশতিলক; **যুধিষ্ঠিরঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **কারয়িত্বা**—সম্পাদন করে; **মুহূর্তম্**—ক্ষণিকের জন্য; **দুঃখিতঃ**—দুঃখিত; **অভবৎ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে ভৃগুবংশতিলক (শৌনক), ভীষ্মদেবের মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্ষণিকের জন্য দুঃখে অভিভূত হলেন।

তাৎপর্য

ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিবারে কেবল একজন মহান নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর, তাঁর ভাইদের এবং তাঁর মায়ের কাছে এক মহান দার্শনিক এবং বন্ধু। মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রমুখ পঞ্চপাণ্ডবদের পিতা মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ভীষ্মদেব ছিলেন পাণ্ডবদের সবচাইতে স্নেহপরায়ণ পিতামহ এবং তাঁর বিধবা পুত্রবধূ কুন্তী-দেবীর তত্ত্বাবধায়ক। যদিও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের দেখাশোনা করার জন্য ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্নেহ দুর্যোধন প্রমুখ তাঁর শতপুত্রের প্রতি অধিক ছিল। অবশেষে পিতৃহীন পাঁচ ভাইকে হস্তিনাপুরের প্রাপ্য রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য এক প্রচণ্ড দলাদলির সৃষ্টি হয়েছিল। রাজপ্রাসাদে সাধারণত যা হয়ে থাকে, এক বিরাট ষড়যন্ত্রে পাঁচ ভাইকে গৃহ থেকে

নির্বাসিত হয়ে বনবাসী হতে হয়। কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁর জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত সর্বদাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দরদী শুভাকাঙ্ক্ষী, পিতামহ, বন্ধু এবং উপদেষ্টা ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে তিনি মহাসুখে দেহত্যাগ করেছিলেন, তা না হলে পাণ্ডবদের অসঙ্গতভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার বেদনা সহ্য করার পরিবর্তে বহু পূর্বেই তিনি তাঁর জড় দেহ পরিত্যাগ করতেন। তিনি কেবল উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করছিলেন, কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের অবশ্যই জয় হবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাদের রক্ষক। ভগবানের একজন ভক্তরূপে তিনি জানতেন যে ভগবানের ভক্তকে কখনো পরাজিত করা যায় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের এই সমস্ত শুভেচ্ছার কথা ভালভাবেই জানতেন, এবং তাই তিনি গভীর বিরহ বেদনা অনুভব করেছিলেন। ভীষ্মদেব যে জড় শরীর ত্যাগ করেছিলেন, তার বিচ্ছেদে তিনি দুঃখ অনুভব করেননি; তিনি দুঃখ অনুভব করেছিলেন একজন মহান আত্মার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ায়। ভীষ্মদেব যদিও ছিলেন একজন মুক্ত পুরুষ, তথাপি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করা ছিল একটি অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু ভীষ্মদেব নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁর জ্যেষ্ঠপৌত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন সেই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদনের অধিকারী। ভীষ্মদেবের কাছে এটি ছিল একটি বরস্বরূপ, যেহেতু তাঁর মতো একজন মহাপুরুষের শেষকৃত্য সম্পাদন করেছিলেন তাঁরই মতো মহান একজন বংশধর।

শ্লোক ৪৭

তুষ্টুবুর্মুনয়ো হৃষ্টাঃ কৃষ্ণং তদ্‌গুহ্যনামভিঃ ।
ততস্তে কৃষ্ণহৃদয়াঃ স্বাশ্রমান্ প্রযযুঃ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥

তুষ্টুবুঃ—সন্তুষ্ট; **মুনয়ঃ**—ব্যাসদেব প্রমুখ মুনিগণ; **হৃষ্টাঃ**—আনন্দিত চিত্তে; **কৃষ্ণম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **তৎ**—তাঁর; **গুহ্য**—গূঢ়তত্ত্ব সমন্বিত; **নামভিঃ**—তাঁর দিব্য নামের দ্বারা; **ততঃ**—তারপর; **তে**—তাঁরা; **কৃষ্ণ-হৃদয়াঃ**—শ্রীকৃষ্ণকে যাঁরা সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন; **স্ব-আশ্রমান্**—তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে; **প্রযযুঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

সমস্ত মহর্ষিগণ গূঢ় বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সেখানে উপস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্তন করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের ভক্ত সর্বদাই ভগবানের হৃদয়ে থাকেন, আর ভগবানও সর্বদা ভক্তের হৃদয়ে থাকেন। সেটিই হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তের মধুর সম্পর্ক। ভগবানের প্রতি অনন্য প্রেম এবং ভক্তির ফলে ভক্তেরা সর্বদাই তাঁদের অন্তরে তাঁকে দর্শন করেন, এবং ভগবানও, যদিও তাঁর কোনকিছু করার নেই বা কোন কিছু চাওয়ার নেই, তথাপি তিনি সর্বদা তাঁর ভক্তের কল্যাণ সাধনে তৎপর থাকেন। সাধারণ জীবের সমস্ত কর্ম এবং তার ফলের জন্য প্রকৃতির নিয়ম রয়েছে, কিন্তু তিনি সর্বদাই তাঁর ভক্তদের সৎ পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকেন। ভক্তেরা তাই সরাসরিভাবে ভগবানের তত্ত্বাবধানে থাকেন। আর ভগবানও স্বেচ্ছায় তাঁর ভক্তের তত্ত্বাবধানে নিজেকে সমর্পণ করেন। তাই ব্যাসদেব প্রমুখ সমস্ত ভগবদ্ভক্ত ঋষিরা সেখানে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। সমস্ত বৈদিক মন্ত্র কীর্তন করা হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। সে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। সমস্ত বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত ইত্যাদি কেবল তাঁকেই অন্বেষণ করছে, এবং সমস্ত মন্ত্র কেবল তাঁরই মহিমা কীর্তনের জন্য। তাই সমস্ত ঋষিরা সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সমস্ত কার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করেছিলেন, এবং তাঁরা আনন্দিত চিত্তে তাঁদের নিজ নিজ আশ্রমের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

ততো যুধিষ্ঠিরো গত্বা সহকৃষ্ণো গজাহ্বয়ম্ ।
পিতরং সান্ত্বয়ামাস গান্ধারীঞ্চ তপস্বিনীম্ ॥ ৪৮ ॥

ততঃ—তারপর; **যুধিষ্ঠিরঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **গত্বা**—গমন করে; **সহ**—সহিত; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **গজাহ্বয়ম্**—গজাহ্বয় নামে রাজধানী (হস্তিনাপুর) ; **পিতরম্**—তাঁর পিতৃব্য (ধৃতরাষ্ট্রকে); **সান্ত্বয়াম্ আস**—সান্ত্বনা দিয়েছিলেন; **গান্ধারীম্**—ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীকে; **চ**—এবং; **তপস্বিনীম্**—তপস্বিনী।

অনুবাদ

অতঃপর মহারাজ যুধিষ্ঠির অচিরেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণসহ তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে গমন করে তাঁর জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও তাতপত্নী তপস্বিনী গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দুর্যোধন প্রমুখ ভাইদের পিতা-মাতা ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী ছিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জ্যাঠামশায় এবং জ্যাঠাইমা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর সেই বিখ্যাত দম্পতি, তাঁদের সমস্ত পুত্র এবং পৌত্রদের হারিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাই অপার ক্ষতিতে গভীর বেদনায় তাঁরা তপস্বীর মতো দিন যাপন করছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্মদেবের মৃত্যু-সংবাদ সেই রাজা এবং রানীর কাছে আরেকটি গভীর শোকের কারণ হয়েছিল, এবং তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে তাঁদের সান্ত্বনার আবশ্যকতা ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণসহ দ্রুত সেখানে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা শোকাকুল ধৃতরাষ্ট্রকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

গান্ধারী যদিও একজন বিশ্বস্ত পত্নী এবং স্নেহশীলা মাতার জীবন যাপন করেছিলেন, তথাপি তিনি ছিলেন একজন মহান তপস্বিনী। তাঁর পতি অন্ধ ছিলেন বলে তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর চক্ষু আবৃত করে অন্ধত্ব বরণ করেছিলেন। পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পতির অনুগমন করা। গান্ধারী তাঁর পতির প্রতি এতই অনুগত ছিলেন যে তিনি তাঁর মতো নিরন্তর অন্ধত্ব বরণ করে নিয়ে তাঁর অনুগমন করেছিলেন। তাই তাঁর আচরণে তিনি ছিলেন একজন মহান তপস্বিনী। আর তা ছাড়া তাঁর শত পুত্র এবং পৌত্রদের একসঙ্গে হারানোর শোক অবশ্যই একজন নারীর পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। কিন্তু একজন তপস্বিনীর মতো তিনি সেই বেদনা সহ্য করেছিলেন। গান্ধারী একজন নারী হলেও তাঁর চরিত্র ভীষ্মদেবের থেকে কোন অংশে কম ছিল না। তাঁরা দুজনেই মহাভারতের দুটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

শ্লোক ৪৯

পিত্রা চানুমতো রাজা বাসুদেবানুমোদিতঃ ।
চকার রাজ্যং ধর্মেণ পিতৃপৈতামহং বিভুঃ ॥ ৪৯ ॥

পিত্রা—তাঁর পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক; **চ**—এবং; **অনুমতঃ**—অনুমতিতে; **রাজা**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **বাসুদেব-অনুমোদিতঃ**—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিত; **চকার**—সম্পাদন করেছিলেন; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **ধর্মেণ**—ধর্মীয় বিধান অনুসারে; **পিতৃ**—পিতা; **পৈতামহম্**—পিতামহ; **বিভুঃ**—মহান।

অনুবাদ

তারপর মহান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি অনুসারে ধর্মের বিধান ও রাজকীয় নীতি-নিয়মাদি কঠোরভাবে পালন করে তাঁর পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির একজন সাধারণ কর-সংগ্রাহক ছিলেন না। একজন রাজারূপে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন, যে দায়িত্বটি পিতা অথবা গুরুদেবের থেকে কোন অংশে কম নয়। রাজাকে প্রজাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পারমার্থিক প্রগতির ব্যাপারে সব সময় সচেতন থাকতে হয়। রাজার জানা উচিত যে মনুষ্য জীবন বদ্ধ-আত্মাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য, এবং তাই তাঁর কর্তব্য হচ্ছে এই সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভের জন্য প্রজাদের যথাযথভাবে পরিচালিত করা।

মহারাজ যুধিষ্ঠির নিষ্ঠা সহকারে এই কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, যা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাবে। তিনি কেবল নিয়মই পালন করেননি, অধিকন্তু তিনি তাঁর বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতিও গ্রহণ করেছিলেন, যিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্, এবং তা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* দর্শনের বক্তা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাও অনুমোদিত হয়েছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির হলেন একজন আদর্শ সম্রাট, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো একজন সুশিক্ষিত রাজার অধীনে রাজতন্ত্র হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা। তা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত আধুনিক জনগণের সরকার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। জনসাধারণ, বিশেষ করে এই কলিযুগে, প্রায় সকলেই শূদ্র; সাধারণত তাদের জন্ম হয়েছে নীচকুলে, তাদের কোনরকম শিক্ষা নেই, তারা হতভাগ্য এবং সঙ্গ প্রভাবে অসৎ। তারা নিজেরাই জানে না যে জীবনের চরম লক্ষ্য কি। তাই তাদের ভোটের কোন মূল্য নেই, এবং এই প্রকার দায়িত্বজ্ঞানহীন ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিরা কখনও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হতে পারে না।

ইতি "শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে ভীষ্মদেবের প্রয়াণ" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।